KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩০৮/২, [illegible] পার্ক, কল-৫৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/3 22/1 23/1	Year of Publication : Oct - Dec 1999 Jan - March 2000 July - Sep _ 2000 Oct - 2001 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

Space donated by

A

***

WELL

******

WISHER

****

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন, লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ সঙ্গীত সংখ্যা

বইমেলা ১৪০৬

সূচি

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় সংযোজন

প্রথম পর্ব

হারানো দিনের গান ১-৬৭

'রেকর্ড সঙ্গীত' বই থেকে নির্বাচিত অংশ

দ্বিতীয় পর্ব

'বিশ্বসঙ্গীত' বই থেকে নির্বাচিত অংশ ১-৬৩

(সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ)

তৃতীয় পর্ব

বিশেষ ক্রোড়পত্র (প্রবন্ধ) ১-৪৪

'হিন্দুসঙ্গীত ও স্যার রবীন্দ্রনাথ'- কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি

(সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ)

সম্পাদকীয়

আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে, এখন যে অর্থে বাংলা গানের চর্চা ও প্রকাশ্য পরিবেশন হয় তা ছিল না। সঙ্গীতচর্চা মূলত বাঙালির সম্ভ্রান্ত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে সমাজের অন্য স্তরে, বাবু ও জমিদারদের বৈঠকখানায় বা বাগানবাড়িতে, বিশেষ করে বাইজি ও বারবনিতাদের নিজস্ব জীবিকার তাগিদে নানাধরণের গানের বহুল প্রচার ছিল। গায়কি যোগ্যতায়, রাগরাগিনী বসানো সুরের রকমফেরে, মার্গ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, সে গানগুলি ছিল যথার্থ মনোহারী। কতো বিচিত্র বিষয় নিয়েই না গান রচিত হতো সে সময়। স্মরণীয় মানুষদের নিয়ে, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকজন নিয়ে, দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য, যেমন মাছ মাংস নিয়েও একই সঙ্গে মজার ও অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় অর্থসঞ্চারী বহুবিধ গান রচিত হয়েছিল। সে সময় সে গানগুলি ছিল সত্যিকারের ভনিতাহীন, জীবনমুখী, তবে তার বাণী এখনকার জীবনমুখী থেকে সব অর্থেই ছিল ভিন্ন।

বিভাব তার চব্বিশ বছরের মুদ্রণজীবনে এর আগেও গান ও গায়ক নিয়ে রচনা প্রকাশ করেছে কয়েকবার। ভীষ্মদেব ও পঙ্কজ মল্লিকের রেকর্ড তালিকা তাদের প্রয়াণের পর প্রথম বিভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে অবশ্য অন্যত্রও হয়েছে। এবারের সংখ্যাটি সম্পূর্ণই সঙ্গীতভিত্তিক। লঘু, গুরু, সবরকম গানই এখানে মুদ্রিত হল। তার সঙ্গে যতটা সম্ভব রচয়িতাদের পরিচিতি। সঙ্গে যে ক্রোড়পত্রটি ছাপা হল তা খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং ১৯১৭ সালে মুদ্রিত এবং প্রতিটি রবীন্দ্রসঙ্গীতপিপাসুর কাছে অবশ্য সংরক্ষণযোগ্য। এটি শ্রীদীপক দে-র সৌজন্যে প্রাপ্ত। অন্যান্য গানগুলি আমরা পেয়েছি প্রখ্যাত সঙ্গীত গবেষক রন্তিদেব মৈত্রর অকৃপণ সহযোগিতায়। পুরান দিনের গান, গায়ক গায়িকা নিয়ে আরো একটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা নিকটসময়ে প্রকাশ করার ইচ্ছে রইল। তার প্রস্তুতিও চলেছে।

সব মিলিয়ে বিভাবের পাঠক পাঠিকাদের কাছে নতুন একটি অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে এই সংখ্যাটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন রাহুল সেন।

এ বছর সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেলেন শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন। তাকে অভিনন্দন জানাই।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশেষ সম্পাদকীয় সংযোজন

মিহির মুখোপাধ্যায় স্মরণে

রবীন্দ্রনাথ একবার ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে বাংলাদেশের পাঠকরা বড় বিস্মৃতিপরায়ণ। কিছুদিন না লিখলেই লেখকের নাম ভুলে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটা অসঙ্গত নয়।

পঞ্চাশ দশকের যে সব পাঠকের স্মৃতি এখনো অম্লান, তাদের কাছে মিহির মুখোপাধ্যায় একটি অবশ্যস্মর্তব্য নাম। এই অপরিমেয় ক্ষমতাশালী লেখক সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। আজকে যারা পঞ্চাশের শ্রুতকীর্তি লেখক, গুরুতে মিহির তাদের অনেকের থেকেই খ্যাতিতে অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁর 'ছোট বিবির রয়ানি', 'ভুঁইদোল' গল্পগুলি প্রকাশের সময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'ছোট বিবির রয়ানি' গল্পটি বাংলাভাষায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্পের তালিকায় স্থান পাবার যোগ্য। উপন্যাসও লিখেছিলেন শারদীয় দেশ ও অন্যান্য পত্রিকায়।

গত এক দশক ধরেই তিনি কম বেশি অসুস্থ ছিলেন। তারো আগে, সাহিত্যের গবেষণা ও অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তিনি তাঁর লিখনক্ষমতার প্রতি নিদারুণ অবহেলা করেছিলেন। বছরে একটি বা দুটি, তার বেশি গল্প তিনি লিখতে চাইতেন না, তাও বন্ধু বান্ধবদের একান্ত অনুরোধ উপরোধে। তাঁর মাত্র তিনটি গল্প ছাপা হয়েছিল বিভাবে। হয়তো কোন অন্তর্গত অভিমানে তিনি ক্রমশই লেখা কমিয়ে দিতে দিতে শেষ কয় বছর একদম বন্ধই করে দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থারও ক্রমাবনতি ঘটছিল। অবশেষে একপক্ষকাল আগে ঘটল প্রয়াণ। তাঁর লেখার পূর্ণ মূল্যায়ন এখনো হয়নি। মিহিরের সমস্ত রচনা, যার পরিমান বেশি নয়, একত্র করে একটি সংকলন প্রকাশ করলে তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার । ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। প্রদীপ দাশগুপ্ত।
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায়। অনাথনাথ দাশ

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮। দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র
অরুণ মুখোপাধ্যায়
এ্যানড্রুজপল্লী (পশ্চিম) পো: শান্তিনিকেতন। পিন:৭৩১২৩৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রাহুল সেন

নামাঙ্কন : পূর্ণেন্দু পত্রী (অতীতের প্রচ্ছদ থেকে)

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯।

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
ইষ্টার্ন বুক এজেন্সি
৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত
বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষরবিন্যস্ত
এবং চিত্রিত ও সময় পাবলিকেশন প্রা. লি. কলকাতা-৭০০ ০৪৭ হইতে মুদ্রিত।

হারানো দিনের গান

'রেকর্ড সঙ্গীত' বই থেকে নির্বাচিত অংশ

দেববালা দাসী

ইন্দুবালা

আঙ্গুরবালা

আশ্চর্যময়ী দাসী

নরসুন্দরী দাসী (নরী)

গোবিন্দ রাণী দাসী

মিস্ আমোদিনী।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

আর কিগো বাজিবে না মরমেরি বীণা মোর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরো কত নিশি হ'বে ভোর॥
এ জীবনের যত আশা, প্রাণ ভরা ভালবাসা
সকলই ত ফুরায়েছে আছে শুধু স্মৃতি-ডোর॥

গজল।

কুঞ্জবনে সাঁজের বেলায়, রাধা রাধা বলে কে বাঁশি বাজায়।
আসিব না ব'লে গিয়েছিলে চ'লে
আবার কেন দুঃখ দিতে গো আসিলে
বাঁশীর তানে উড় মরি মরি, কি করি কি করি
প্রাণ যে যায় হায়।

ঝিঁঝিট মিশ্র।

দেখা কেন দেওনা সখা,
একা থাকি কেমন করে,

না দেখিলে প্রাণে মরি,
প্রাণ যে কেমন করে।
তুলসী কুসুম লয়ে করে,
আছি সখা দাঁড়াইয়ে,
তুমি এলে তোমার পায়ে
সাজিয়ে দেব থরে থরে।
মজেছি হে তোমার প্রেমে,
পড়েছি বাঁধা চরণে
কালাচাঁদ নিজগুণে রেখো মোরে শ্রীচরণে।

সিন্ধু খাম্বাজ।

হাসিস্ কেন বল্‌না কুসুম,
প্রাণ ভোলান মুখটী তুলে।
মুখে লুকিয়ে রাখিস মধু
বল্‌না কারে দিবি বলে।
ধীরে ধীরে ধীর সমীরে
কি কথা তুই বলিস্ কারে ;
বল না কে তোর আছে আপন,
ভাল বাসিস্ হৃদয় খুলে।

কেদারা (কমিক)।

কত করে বাছিয়া: যতনেতে রাঁধিয়া,
রাখিনু সাজায়ে সখা, খাইবে বলিয়া।
ডিম ভাজা দম ভাতে, ঝালে ঝোলে অম্বলেতে,
আসি বলে, কই এলে, সেই গেলে চলিয়া॥
অনেক হয়েছে রাতি—এস প্রিয়ে মাথা খাও,
ম্লানমুখী নিশাবাতি—আছি বসে দেখা দাও,
কিনে ইলিশ খেলে না'ক, মলে দুঃখ যাবে না'কো,
এ' পোড়া বরাতে নিলে, বেড়ালে তা তুলিয়া॥

দাদরা।

আড়াল থেকে উকি ঝুঁকি, মারবো কত আর।
সাম্‌নে আসি' শুনি বাঁশী হ'বে যা হ'বার (আমার)।
লোক ভয় থাকে যথা, প্রেমটা তথা মুখের কথা,
প্রাণে যদি লাগ্‌লো ব্যথা, ছুটলো নেশা তা'র।
যদি প্রাণ প্রেমের তরে, সপে থাকি শ্যামের করে,
ভাববো তবে কিসের তরে, ঠ'কবো বারে বার।

ঝিঁঝিট।

কত মরমের কথা রেখেছি যাপিয়া,
কহিব তোমারে বলিয়া গো।

কত বরষের পরে পেয়েছি আজিকে
যেওনা যেওনা চলিয়া গো ॥
কত শারদ সন্ধ্যায় মধু জোছনায়
কাঁদিয়াছি সখা কাঙ্গালিনী প্রায়
কত হা হুতাশ দীরঘ নিশ্বাস
রয়েছ হৃদয়ে মিশিয়া গো ॥

মিস্ নন্দরাণী

বেহাগ মিশ্র।

স্বপনে দেখা দিয়ে মরমে দিয়ে ব্যথা
বিষাদ ঢেলে প্রাণে চলিয়ে গেছ গো।
স্বপনে কয়ে কথা আমার কানে কানে,
নিমেষে মিলাইল কে জানে কিসে গো।
পুরাণ কত স্মৃতি জাগায়ে মৃত প্রাণে,
কাঁদিল কাঁদাইল ধরিয়ে চরণে—
সুপ্তি ভেঙ্গে গেল মরম ছিড়ে গেল,
কেমনে পাব সেই স্বপন ফিরে গো ॥

মিস্ আঙ্গুরবালা।

গৌরী মিশ্র

আমি হ'ব না তোমার বাধা।
শুধু পথে যেতে তব সরাইব বাধা ॥

কাছে কাছে রব বাঁধা।
হ'ব প্রখর আতপে ছায়া
শীতলিতে তব কায়া
পবনের পায়ে মেগে নেব সখা মন্দ মধুর হাওয়া।
বর্ষধারা মুছাব আঁচলে মিলাব চাঁদের সুধা ॥

বেহাগ মিশ্র।

দেখা হ'বে ছাঁদনা তলায়,
বলে গেল ইসারায়।
ঘটা করে বর এসেছে চুপি সাড়ে দেখে পালায় ॥
বসে বর সভার মাঝে, হেথা আসা তার কি সাজে
লোকের কাছে পাছে লাজে যৌবন ভরে পড়ে যায়
ছি ছি কি আধিখ্যেতা বোঝে না মরমের ব্যথা
না খেলে লাজের মাথা মন যোগান হ'বে দায় ॥

হাম্বীর।

বাঁধা যার কাছে মন।
সে করে অযতন ॥
তারি অদর্শনে বাঁচিনে বাঁচিনে,
অধীর পরাণে ধৈর্য্য না মানে,
কতদিন আর প্রবোধ বচনে,
মানে না বারণ।

যতন করিয়ে হৃদে ধরি যারে,
সে যদি গো মোরে অযতন করে,
কার তরে আর জীবন যৌবন,
রাখি বল কি কারণ ॥

খাম্বাজ।

সারা সকালটী ব'সে ব'সে আমি,
সাধের খোঁপাটী বেঁ ছি।
অসুখের ছলে, বসিয়া বিরলে,
খোঁপাটী আমার বেঁধেছি ॥
রাঁধিতেছিল সে হেঁসেলের কোণে,
রুগ্না, বৃদ্ধা শ্বশ্রূ,
রাঁধিতেছিল সে মৎস্যের ঝোল
ঝরিয়া তাহার অশ্রু,
তখন ঘর দোরে কাঁসি, পড়েছিল বাসি,
আসেনিকো দাসী ভবনে,
সব হ'তে স'রে খিল দিয়ে ঘরে,
খোঁপাটী আমার বেঁধেছি।
বঁধু খোঁপাটী আমার বাঁধা নয় শুধু,
গুছিটি গাছিটি কুড়ায়ে,
সারা বিশ্বনিতে সাঁচ্চার ফিতে,
পরতে পরতে জড়ায়ে;

আছে সবার উপরে আঁটা তায়
চিরুণি ফুলের রাশি গো,
দেখ একবার খোঁপাটী আমার,
তোমারি কারণে বেঁধেছি ॥

জঙ্গলা।

তোমারই গৃহে পালিত স্নেহে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ: তোমার দান,
তুমি ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ আমারে,
জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন,
করেছে আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমি ধন্য ধন্য হে।
হৃদয় বাহিরে স্বদেশে বিদেশে,
যুগযুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে
তুমি ধন্য ধন্য হে।

— —

খাম্বাজ।

আমি গিয়াছিনু যদি আনিতে কিছু দিয়া সব আজি এসেছি।
মনের মাঝেতে কাহারে খুঁজিতে আপনা হারায়ে ফেলেছি॥
সেদিন উঠেছিল যেমতি জোছনা তাহারি বর্ণ হইল ম্লান,
আমি নীরব নয়নে ক্ষুদ্র এ প্রাণে তাহারি মূরতি এঁকেছি॥
প্রভাত কিরণে হাসিছে ধরণী ধীরে ধীরে চ'লে যায়,
আমি নিখিল বিশ্ব হারায়ে তখন পড়িনু লুটায়ে তাহারি পায়॥
তারি মুখচ্ছবি রাখি স্মরণে শুক্ল রজনী শয়নে,
আমি নিমেষে তাহারে দেখেছি ভাল নিমেষে প্রাণ দিয়েছি॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

আমি কত আশা ক'রে, তোমারি দুয়ারে ভিখারির বেশে এসেছি॥
খোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল, দেখ দেখ কত কেঁদেছি॥
কি আছে আমার জান না কি তুমি, পথে পথে কেন কেঁদে
বেড়াই আমি,
যা ছিল আমার সকলি এবার বুঝি বা হারাতে বসেছি।

কানাড়া মিশ্র।

আমাদের, আমার বলিতে কে আর, যারা ছিল তারা গিয়েছে।
পাঁজর ভেঙ্গেছে, ঝাঁজর হয়েছে, বাকি শুধু প্রাণ রয়েছে॥
উদাস্ নয়নে চারিধারে চাই, আপন বলিতে কারেও না পাই,
আপনার যারা ফেলে গেছে তারা, এ হৃদি শশ্মান হয়েছে।

পিলু বারোঁয়া।

চরণে কিসে হয়েছি অপরাধী।
বলে দাও মাথা খাও, আমি চরণে ধরিয়া সাধি॥
কেঁদে কেঁদে গেছে সারাটি জীবন, দাঁড়াও দাঁড়াও কেন চলে যাও,
হয়োনা আমার সুখে প্রতিবাদী।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

আমি স্বগাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম তাই প্রাণে বড় বাজে গো।
নিজ হাতে গড়া খেলাঘর খানি লাগিল না কোন কাজে গো।
এসেছ যদি হে এস আরো কাছে, দেখ এ হৃদয়ে কি জ্বালা রয়েছে,
কি যাতনা তুমি ত জান না, তাই মরি লোক লাজে গো॥

দাদরা।

কে দিল তোমার গলে বনফুলের মালা।
কোথা হ'তে পেলে তুমি ও চিকণ কালা॥
যাও যাও বঁধু এসনা কাছে, তোমার প্রেমেতে কাজ কি আছে,
তুমি আস, মান রাখি, কর কত ছলা॥

গজল।

কি গুণ বল কি গুণ জানে হরি হে তোমার বাঁশের বাঁশী।
এই কি সাধনা তার কি মহিমা তোমার কেমনে ঢালে সে
অমিয় রাশি॥

পশিলে শ্রবণে সে স্বর-লহরী, জানি না কেন যে আপনা পাসরি,
কেন বা উঠে পরাণ শিহরি কে যেন মরমে পরালে ফাঁসি ॥

ভাটিয়ালি

রাধে তোর তরে ছল করে বাজাই বাঁশী।
তোর মুখ পানে, চাহি আকুল প্রাণে
চেয়ে চেয়ে দেখি তোর সুধা মাখা মধুর হাসি ॥
আমার সাধা বাঁশী রাধা রাধা বলে ডাকে তাই
সকলেই জানে,
আমার গোঠে যাওয়া হয় না বেশ ভূষা হয় না,
সদাই কদমতলায় থাকি, কেউ মানাও ত করে না।
(রাধে) প্রেমের গুরু তুমি আমার, আমি তোমার কাল শশী
তোরে বড় ভালবাসি ॥

পুরবী।

তুমি যা কর তা কর হরি
আমিত চলিলাম জলে,
বড় লজ্জা পাবে তুমি
দাসী তোমার লজ্জা পেলে,
জল আনিতে যাই ঘাটে যদি কোন বিঘ্ন ঘটে,
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥

ছায়ানট।

বাঁধ না তরীখানি আমার এই নদীকূলে।
একা যে দাঁড়ায়ে আছি লহনা আমারে তুলে ॥
কোথা হ'তে আস তুমি বাহিয়ে তরণীখানি,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে কোথা যাও নাহি জানি,
যখনি হেরেছি, মন সঁপেছি তোমারে ভুলে।
সাজায়ে এনেছি ডালা রেখেছি এই নদীতটে,
শুনেছি তোমারি গান রাগিনী সেই ছায়ানটে,
যাবে যাও চ'লে তুমি থেকোনা আমারে ভুলে ॥

ভাটিয়ালি।

কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথ পানে কভু তমাল পানে,
চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজল পরা জোড়া আঁখি ॥
কালা বাজে যখন তোমার বাঁশী,
ঘরকন্না সব ভুলে যাই অম্নি রে আসি ;
আমার কেশ বাঁধা হয় না, গা ঘষা হয় না,
আমাদের পা ঘষা হয় না, আরো হয়না কত কি।
(ও ছাই মনেওত পড়ে না)
কালা আমি তোমায় ভালবাসি ব'লে,
তাই কি তুমি ধর করে (ও আমার) কাল বাঁশী ॥

খাম্বাজ মিশ্র।

গোপিকা প্রাণধন গোকুল রঞ্জন কাঁহা মেরি প্রেমময়ী রাধা।
তোমায় না হেরিলে বিরহে তনু দহে এস হে হৃদয়ে কি আধা॥
আয়নে সপিয়ে তোমায় দুঃখনলে দহে হৃদয় রাই নামে বাঁশী সাধা।
যমুনা পুলিনে মধুর মুরলী তানে নিবারি প্রাণের প্রেম ক্ষুধা॥
রঙ্গে রাখাল সনে ধেনু চরাইনু বনে সঙ্গে লয়ে বলাই দাদা।
তোমারি মানের দায়ে ধরেছিনু দুটি পায়ে মাথায় বহেছি নন্দের রাধা

———

পরজ।

কে বলে শ্যাম তোমায় কালো,
যে যা বলে বলুক লোকে কালই আমার ভাল।
কাল বলে যে যে লোকে, দেখুক তারা আমার চোখে,
দেখবে চাঁদের কিরণ মাখা ভুবন ভরা আলো॥

———

সাহানা।

দুঃখ দেহ যদি তাহে নাহি ক্ষতি
সহিবারে দেহ শকতি,
তোমারি দান এ কারণ যদি
চাহি না লভিতে মুকতি;

তোমার করুণা নিখিল জগতে
কোন্ পথে চলে কে পারে বলিতে
দুঃখ সুখ নাথ মিলিত তোমাতে
তোমার কঠিন মুরতি।

———

সুরট মল্লার।

তোমায় কি দিয়ে তুষিলে প্রাণ তোমায় পাব
মুখ ফুটে বলে দাও না দাও না,
কি কথা কহিলে ভাল গো বাসিবে,
তেমন দুটো কথা কও না কও না।
যেখানেই রাখি থাক গো অসুখী,
কোথাও কি সুখ পাও না পাও না;
কাছে কাছে রাখি কাঁদ মুখ ঢাকি,
কাছে থেকেও কি সুখ পাও না পাও না;

———

(ভাঙ্গা কীর্ত্তন)

নবঘন শ্যাম, মুরতি মনোহর
হামারি হিয়াপরে জাগে।
শ্রুতিমূলে চঞ্চল, কুণ্ডল মণিময়
পীতবাস দোলে পীত ভাগে।
ইন্দু বিনিন্দিত, কুন্দ কুসুম হাস
মণ্ডিত তব পদ যুগে।

মিনতি চরণ পরে ভকতি মিলাও বঁধু
নিতি নিতি নব অনুরাগে।
নীল নলিনীদল, আঁখি দুটি উজ্জ্বল
বিজলী চমকে রূপরাগে।
শত বিধু-নিন্দিত, চারুমুখ পঙ্কজ,
শিখি-পাখা শোভে শির-তাজে।
ভৃগুপদ চিহ্নিত, বিশাল-হিয়া মাঝে
পরিমল ফুলহার রাজে।

(ভাঙ্গা কীর্ত্তন)

শ্যাম মনে কি পড়ে গো যমুনায়,
যার পুলিনেতে বসি, ওহে কালশশী
শুনাইতে বাঁশী শ্রীরাধায়।
কোথায় ময়ূরী বকুল ডালে
কোথায় নন্দ গোপাল তোমার
রাখিলে পরাণ গো-পালে
তুমি ভকতের হরি, জীবনে মরণে
ভকতের লাগি ধরিতে চরণে
তাই হে মিনতি দাও হে সুমতি
ঠাঁই যেন পাই রাঙ্গা পায়।

বেহাগ।

আমি ভাবনার হাত হ'তে
এড়াব মা কেমন ক'রে
যত ভাবি, ভাবিব না
তত যেন চেপে ধরে।
যত হাঁসি খেলা করি
ভাবনা মোর সহচরী
সদা ভেবে ভেবে মরি
পার হব মা কেমন করে।

আড়ানা।

ডাক দেখি মন তেমনি ক'রে
মা আমারে দয়া ক'রে
ডাকের মতন ডাকলে পরে
মা কি আমার থাকতে পারে।
দয়াময়ী মা যে আমার
আছেন তিনি জগৎ জুড়ে॥

পরজ মিশ্র।

প্রাণে ব্যথা দিয়ে যেওনা যেওনা
অবলা কাঁদালে ভাল তো হবে না।
আমি যে অবলা কিছু নাহি জানি,
প্রাণসখা তুমি যেওনা যেওনা।

আমি যে তব প্রেমের ভিখারী
কাঁদায়ে আমারে যেওনা যেওনা।
যাবে যদি তুমি ওহে প্রাণসখা,
মরম বেদনা দিও না দিও না॥

—০—

সুরট মিশ্র।

ভাল বাসে কি না বাসে জানি না,
ভালবাসে যে সে জানে।
আমি তো ভাসি সুখেরি সাগরে,
তারি দরশনে॥
একবার তারে হেরিলে নয়নে,
চেয়ে থাকি আমি আকুল পরাণে,
মনে হয় তারে হৃদয়েতে রাখি,
দিবানিশি যতনে॥

———

পথের কথা বলে দেবে কে আমাকে,
আমি যাব রে যাব রে সে দেশে যেথা সে থাকে।
বসে আছ তুমি কোন বনে, কার ধ্যানে এক মনে,
গাহিছ ও কি গান, করুণা নিদান, শুনে আকুল হল প্রাণ—
যাব কোন পথে, যাব কার সাথে,
পথের মালিক কোথায় আমি পাব তোমাকে॥

———

বাগেশ্রী।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি রব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি॥

———

খাম্বাজ।

শ্যাম তুমি বাঁকা, বাঁকা তোমার মন।
বাঁকায় বাঁকায় মিলে গেছে, বাঁকা মদন মোহন॥
বাঁকা তোমার শিখী বাঁকা, বাঁকা তোমার চূড়া বাঁকা,
বাঁকা তোমার চরণ বাঁকা, বাঁকা দুনয়ন।

———

ভৈরবী।

ছি, ছি, হেরে গেলে শ্যাম (তুমি)
ডুবে গেল তোমার ভুবন ভরা নাম॥
শকতির কি দাও পরিচয়,
ধরতে জান রমণীর পায়,
তুমি ভাগ্য, তুমি বিধাতা,
কে তোমায় হ'ল বাম॥

———

গজল।

কি সুর বাজে ভাঙ্গা হৃদি মাঝে,
আমি জানি, আমার মন জানে।

কাহার ও ছবি, হৃদে রেখে ভাবি,
আমি জানি, আমার মন জানে ॥
যখনই ভাবি তোমারে পাব না,
তখনই জাগে মনেতে ভাবনা,
সে যে কি যাতনা, তুমি তো বোঝ না,
আমি জানি, আমার মন জানে ॥

গজল।

(আমি) কাননে কাননে তোমারি সন্ধানে,
বেড়াব দেখা কি পাব না।
মিলনেরি আশা নিভে যায় যদি,
তবু কি গো দেখা পাব না ॥
কি ফল জীবনে নিরাশা মাখানো,
কি হবে প্রণয় বিরহ জ্বালানো,
যদি আঁখি ধার না ঘোচে আমার
চোখের দেখা কি গো পাব না ॥

মিস্ আশ্চর্য্যময়ী

জয়দেব।

সই হরি কি আমার বর
তবে হাস মৃদু হাসি, ধর করে বাঁশী বাজালো বাজালো
কিশোরী-ভোলা-স্বর ॥

খুলি কটীবাস, পর পীতধড়া,
নে লো শিরে সখি, মোহন শিখিচূড়া,
চুঁড়ি চল গোঠে, যমুনার তটে, সাজ সে রাখাল নটবর ॥

জয়দেব।

আমায় কি দিয়ে সাজাবে মা,
আমি হব না ত গৃহবাসিনী।
কোন্ প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন, হইলে গো সন্ন্যাসিনী ॥
ছাই ভস্ম তার হয় অলঙ্কার,
পারিবে কি দিতে সেই উপহার।
পার যদি দাও, সে ভাবে সাজাও,
যেন কাঁদাও না অভাগিনী ॥
আমি কাঁদিব না তুমি গো কাঁদিবে
ভাসিব আবেগে আঁখির সলিলে।
হৃদয়ের বল নাশিবে সকল,
তোর ছল ছল আঁখি স্নেহ-কাঙ্গালিনী।

ভৈরবী।

কেউ ভাল মোরে বাসে নি ত কভু তুমি তাই ভাল বেসেছ।
যতনে কেহ ত কহে নি ক কথা তুমি হেসে কথা ক'য়েছ ॥
আজনমের এই আঁধার নাশিতে, আজনম দুখী হৃদয় তুষিতে,
পথে চলে যেতে কহেনিকো কেহ তুমি তাই আজি এসেছ।
দীর্ঘ বরষের সঞ্চিত জ্বালা জুড়ায়ে ভুলায়ে দিয়েছ ॥

জঙ্গলা।

(ওগো) দাও সারা দাও কও কথা কও
বরষি অমিয়া শ্রবণে।
এস প্রিয়তম দেবতা আমার
এস গানে এস ধেয়ানে॥
স্নিগ্ধ মাধুরী মধুর মিলনে
স্বপন-বিলাস-বিজড়িত জ্ঞানে,
হৃদয় মাতান কুসুম গন্ধে
এস দীর্ঘ বিরহ অবসানে।

———

মোগল-পাঠান।

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা দিয়েছিলে ভালবাসা,
গিয়াছে যখন, যাক্‌না তখন, মিছে কেন কর আশা।
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার
যেতে চাহে যাহা ইতি কর তার,
করুণার সার, বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে
এসেছ জগতে শূন্য দুহাতে
তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল—বিষাদের কেন ভাষা।
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ
টুটুক প্রমাদ, মিটে যাক্ সাধ
কৃপায় যাঁহার, যা নহে তোমার মিটেছে তাহার আশা।

———

দেবলা দেবী।

কতবার ডেকেছি কত গান গেয়েছি,
অসাড় হ'য়ে ছিলে প'ড়ে, বধির ছিল কাণ।
আজ্‌কে হঠাৎ চম্‌কে উঠে—
দেখ্‌ছ বিশ্ব নিচ্ছে লুটে—
রবির তরে কমল ফেটে আকুল করে প্রাণ॥
আর ত আমি গাইব না,
পাছু ফিরে চাইব না
চুপটী করে আঁধার ঘরে থাক্‌ব করে মান॥

———

দেবলা দেবী।

আমার যা কিছু ছিল সকলই বিলায়ে দিয়াছি
তোমাতে হারাইয়ে।
তব চরণ-জড়িতা, আশ্রিতা লতারে যেওনা
যেওনা দলিয়ে॥
আমি ক্ষণিক না রব, হ'য়ে তোমা হারা,
তুমি শ্বাস বায়ু মোর নয়নের তারা,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পুলক উজ্জ্বল, লভি তোমারই কিরণ ধারা
(আমি) তব অদর্শনে বাঁচিব না কভু যাবে জীবন
প্রদীপ নিভিয়া।

—০—

দেবলা দেবী।

কাছে কাছে আছ তবু কেন দূরে।
ধরা দিয়ে পুনঃ কেন যাও সরে॥
সুখ মাঝে সখা এ যে বড় দুখ,
শীতল অনলে জ্বলে যায় বুক,
সহেনা সহেনা এ বড় যাতনা,
প্রলয় ভীষণ আলোক আঁধারে।
তোমার ও পরশে পরাণ পুলকে,
হরষে মাতিবে আঁখির পলকে,
এস এস নাথ হে চিরবাঞ্ছিত,
প্রেমের ভিখারী দাঁড়ায়ে দুয়ারে॥

———

দেবীচৌধুরাণী।

আমি সদাই হেসে হেসে বেড়াই ভেসে ভেসে
এ ভব-সাগরে ডরি না।
যাঁর তাঁরি আমি তাঁরি অনুগামী—
তাঁরি কর্ম্ম বই করি না।
এনেছে এসেছি রেখেছে রয়েছি
রূপ দেছে রূপে রূপসী হয়েছি—
ঢল ঢল ঢল যৌবন পেয়েছি—
তাঁরি প্রাণ বই ভজি না॥
রূপ দিছি তায় দেখুক শুনুক
যৌবন দিয়েছি রাখুক ঢাকুক

প্রাণ দিছি ভাল বাস্‌তে হয় বাসুক,
অত শত ভেবে মরি না॥

———

দেবীচৌধুরাণী

ঝর ঝর দর দর নয়নে বারি কেন কেন কিশোরী।
যদি সোহাগে তাকাস গতি শ্রীপতি তরী॥
ওলো সে ভালবাসা এ মর তলে রমণী পুজে সোহাগ ভরি।
কোলে তুলে নে তুলে নে ওলো শ্রীহরি স্মরি॥

———

কমিক:

(তোমরা ও আমরা)

(তোমরা) হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে
(ঘরে) মোরা বন্ধ রহি;
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
ভাবিয়া অবাক হই;—
আপিসে কাটাও তামাক গল্প গুজোবে
পরে হুজ-গজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজ পত্র গুছোবে
কোরে গোটাকত সহি।
সরটী ক্ষীরটী তোমরা খাও
(আর) মোরা খাই তার দহি।
যতক্ষণটী তোমরা না বাড়ী ফেরো
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।

তোমরা খাইবে আমরা রাঁধিব,
না খাইলে মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে আমরা কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই ?
তোমরা সহর ঘুরে বেড়াও রাতে,
সেটা যেন কিছু নহে ;
আমরা কাহারও সহিত কহিলে কথা,
তোমাদের নাহি সহে।
তোমাদের চাই মেজ খাস কামড়া,
আমরা ধোয়ায় রহি না জ্যান্ত না মরা,
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা,
মোরা সে সময় কেহ নই।
প্রেমের সুখটী তোমরা লুটিতে চাও
(তার) যাতনা আমরা সহি,
পুত্র সাধটি তোমরা করিবে
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর ছেলে যখন বেড়ায় খেলিয়া
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
রাত্রে কাঁদিলে ছেলে ঘুমটী ভাঙ্গিলে
বকুনি আমরা সহি।

———

মিস্ বরদাসুন্দরী

কীর্ত্তন।

(আমি) কি আর বলিব তোরে হে বঁধু,
(কি আর বলিব তোরে)
(আমি) আপনি সাধিয়া পিরীতি করিনু,
রহিতে নারিনু ঘরে।

(রইতে দিলি না বঁধু)
(ঘরে রইতে দিলি না বঁধু)
তোমার সনে প্রেম করে,
ঘরে রইতে দিলি না বঁধু।

এবার যা হবার তা হল,
মন ফিরে দাও প্রাণ বাঁচুক তাই ভাল।

এবার যা হবার তা হল,
বলি তোমার প্রেমে কাজ নাই রে,
তোমার লাগিয়ে বঁধু হে—
বঁধু হে ওহে প্রাণবঁধু—
ওহে নিরদয় ওহে প্রাণবঁধু—
এবার কামনা করিব সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধ।
(বঁধুহে বঁধুহে বঁধুহে)
নারী হব না রে—
(আর নারী হব না রে)
বলি নারী হবার বড় জ্বালা,
আর নারী হব না রে।

কীর্ত্তন।

দেখে এলাম তারে সখী,
দেখে এলাম তারে গো।
এক অঙ্গে এত রূপ,
নয়নে না ধরে গো॥
এমন কভু দেখি নাই
(এক অঙ্গে এত রূপ কভু দেখি নাই)
যেমন চাঁদ উঠেছে,
(দুকুল আলো করে যেন চাঁদ উঠেছে)

যমুনায় যেন চাঁদ উঠেছে,
অধরে মুরলী লয়ে
কদম্বে হেলন রে।
আমার হিয়াতে জাগে,
সেইরূপ আমার হিয়ায় জাগে।
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ মূরতি
আমার হিয়ায় জাগে,
(মূরতি খানি রে)
(বলি) এমন রূপ ত দেখি নাই
আমার হিয়াতে জাগে,
(সেইরূপ আমার হিয়াতে জাগে)
মূরতি খানি হিয়াতে জাগে।

কীর্ত্তন।

শুন ওলো ধনি চতুরা রমণী
গরবেতে সদাই থাক
(আবার) জনম তোমার হইবে সফল
বদন ফিরায়ে দেখ
(জনম সফল হবে) (নারীর জীবন সফল হবে)
(একবার বদন ফিরে চেয়ে দেখ)
(আবার) গরবে পৃথিবী দেখ সরা খানি
ডাকিলে না শুন কানে

(এত কিসের গরব) (বলি নারী জাতির এত কিসের গরব,
ব'লি ডাকিলে কথা শোন না হে)
(তান) গরবীনি প্রেমময়ী
আবার আপন যৌবন,
(তান) রাধে প্রেমময়ী গরবিনী।

—•—

কীর্ত্তন।

খেলার রসে ছিল কানাই শ্রীদামেরি সনে।
হেন কালে শ্রীরাধারে পড়ে গেল মনে ॥
(ওমনি হোল) (ওমনি রাধা বদন মনে হোল)
(বিনোদ খেলা খেলতে খেলতে রাধা বদন মনে হল)
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়ে।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হয়ে ॥
(বলে রাধে) (বাঁশীতে বলে রাধে রাধে)
(কোথায় বৃন্দাবন বিলাসিনী বাঁশীতে বলে রাধে রাধে)
(তান) (গরবিনী,—মানিনী—প্রেমময়ী রাই ধনী)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

আমি আধভাঙ্গা ঘুমে ঘুমাইতেছিনু
কেন একেবারে ভাঙ্গিল।
ভালবাসা-বাসি ভুলিতে আছিনু,
কেন পুনঃ মনে জাগিল।

কাছে হ'তে ক্রমে দূরে যেতেছিনু,
স্মৃতির অনল নিভাইতেছিনু,
কাছে কাছে এল দূরে দূরে গেল,
স্মৃতি কেন পুনঃ জ্বলিল।

খাম্বাজ।

আমি বড় আশা ক'রে এসেছি দুয়ারে
শেষ দেখাটুকু দেখিতে,
সে কি আসিবে না ফিরেও কি চাবে না
কেঁদে কি হবে গো ফিরিতে।
ভিখারীর আশা অধিক ত নয়
কিছু ভিক্ষা পেলে হাসিমুখে লয়
সে ভিক্ষার আশাতে, আজি এ প্রভাতে,
পাব না কি লভিতে।

মিস্ বটরাণী।

সাজাহান।

(তুমি) বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি হে,
আমি পারি না যে যেতে ছাড়াতে।
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগূঢ় মধুর,
প্রিয় বান্ধিত কারা এ।
এ যে চলে যেতে বাজে চরণে,

এ যে বিরহে বাজে স্মরণে,
মিলনেরি হাসে চুম্বনের পাশে হারায়ে ॥

সাজাহান।

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই,
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি পরাব বলিয়া তোমার গলায়,
মালাটি আমার গেঁথেছি ॥
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু,
করি নাই কিছু বঁধু আর।
শুধু বকুলের তলে বসিয়া বিরলে,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা প'রে
সুললিত স্বরে পাপিয়া,
তখন দুলিতেছিল তরুশাখা ধীরে
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া,
তখন প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি
কুসুমে-কুঞ্জ-ভবনে ;
আমি তার মঝখানে বসিয়া বিজনে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নয় শুধু
বকুল-কুসুম কুড়ায়ে,

আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি
কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ॥
আছে সবার উপরে মাথা তায় বঁধু
তব মধুর হাসি গো।
ধর গলে ফুলহার মালাটি তোমার
তোমার কারণে গেঁথেছি ॥

স্বর্গীয়া বেদানা দাসী।

খাম্বাজ দাদ্‌রা।

বাজাওয়ে চিকণ কালা,
মনপ্রাণ হরে নিল পাইয়ে অবলা।
গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধরে বাজাওয়ে বাঁশী ;
পারি না যে দেখে আসি, ঘটিল কি জ্বালা ॥

জঙ্গলা।

(বুঝি) ফাঁকি দিয়ে গেল নিয়ে নাগরে তোমার।
সখি কোথা হতে দুঃখ দিতে এলোরে আবার ॥
নূতন বঁধু নূতন মধু নূতন সোহাগ।
নূতন পেলে শুকনো ফুলে আসে কি লো আর ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি।
পাগল করেছে তোমার ঐ দুটী আঁখি॥
কে যেন মজায়ে, রেখেছে প্রাণ লুকায়ে,
সাধ হয় সদা, বুকে করে রাখি॥

খাম্বাজ ঠুংরি।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা,
চোখের দেখা দিতে এস না। (বঁধু)
ভাল বেসে যদি দুঃখ পাও সখা,
পায় ধরি ভাল বে'স না॥
একলাটি বসিয়ে সারাটি দিন আমি,
চেয়ে রব ঐ পথের পানে;
সারাটি রজনী একেলা জাগিয়ে,
চাঁদ জাগিবে আমার সনে,
যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়া,
স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না।

বেহাগ খাম্বাজ—কেরতা।

গোঠে হ'তে আইল নন্দদুলাল। (আমার)
গোধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া, ব্রজবাসীগণ সব ধায়;

মঙ্গল থারি দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায়;
ধেনু বৎসগণ গোঠে পরবেশল,
মন্দিরে চলে নন্দলাল,
আকুল পন্থে যশোমতি ধাওল,
ঝর ঝর দুটী আঁখি লাল॥
পাগলিনীর মত, (হায় পাগলিনীর মত)
ধারার বিরাম নাই, প্রেম ধারার বিরাম নাই (বিরাম নাই)

পুরবী—একতালা।

বাজে শ্যামের মোহন বেণু
বেণু রব শুনে জুড়াল তনু॥
যে বনে বাজিছে সেই বনে ধাই,
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই;
পুরাইব আশ মন-অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্যামের চরণরেণু॥
পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াছে তান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান,
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু॥

জঙ্গলা খেম্‌টা।

বহুদূর হতে এসেছি বঁধু, বারেক ফিরিয়া চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পুরেছি বঁধু, আর কেন চলে যাও হে॥

হৃদয়ে রেখেছি প্রেম সরোবর, হাসির কমল তায়,
আদরে হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাধব শীকর গায়
কতই করিব খেলা—
প্রাণে দিব আশা বুকে ভালবাসা করিব পিরীতি মেলা।
আদর সোহাগ রেখেছি বঁধু একবার ফিরে চাও হে ॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

ঐ দেখা যায় ঘরখানি ও যাদুমণি।
আমি বালাখানা কোথায় পাব আমি দুঃখিনী মালিনী ॥
এস যাদু আমার ঘরে, আমি রাখ্‌বো তোমায় হৃদ্‌মাঝারে ;
মাসী বলা ছেড়ে দেরে, তুমি নাতি আমি দিদিমণি ॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

আসিবলে কেন প্রাণে ব্যথা দাও।
এমন নিলয় তুমি কাঁদিয়ে চলে যেতে চাও ॥
যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,
পায়ে ধরি প্রাণনাথ হৃদে এসে প্রাণ জুড়াও ॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু,
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু,
দশদিশ ভেল নিরানন্দা ॥

আজু মজু গেহ গেহ করি মানিনু, আজু মজু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হওল টুটল সবহ সন্দেহা ॥
সোহি কোকিল আব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ আব লাখ লাখ হউ মলয় পবন বহু মন্দা ॥

যৎ।

ভাল যদি বাস হে সখা !
দূরে থাক স'রে স'রে, দিওনা দেখা ॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছ হাসি ভুবন আলো
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা ॥
রওহে রওহে দূরে,
এ ভাল দেখিহে তারে,
কাছে গেলে চাঁদ সুধা নয়,
প্রেম কি প্রমাদ সখা, সকল সময় ;
নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত রেখা।

ঠুংরি।

মরম ব্যথা কব লো কারে, আছি মরমে ম'রে !
যার ব্যথা সেই জানে, জানে না পরে ॥
সজনি আগে জানিনে,
এ ফুল বাসে কুটিল কীট নিবাসে ;

তা হ'লে কি সই, আমি ফুলে বসে রই,
গঞ্জনা-জ্বালাতে জর জর হই ?
কি জানি কি কালে ফুলটী আমার
সাধের হার পরেছি গলায়।
বল দেখি প্রাণ সখি আজি কব লো কারে ॥

কমিক।

চাই বেল ফুল ॥
আমার এ ফুলের গন্ধে প্রাণ করে আকুল ॥
মতিয়া বেল টাট্‌কা তোলা, এনেছি গ'ড়ে মালা,
এ মালা পরলে গলে, কত নাগর অম্‌নি ভোলে ॥

—•—

কমিক।

আমি ফেরি করি পাড়ায় পাড়ায় বেলওয়ারী চুড়ি।
চুড়ি কেনে কত সোহাগভরে যুবতী ছুঁড়ী ॥
আমার চুড়ির এমনি গুণ, নিবে যায় সই মনের আগুন,
হাতে পড়লে প্রাণ্‌টা করে,
ওলো সই মাইরী মাইরী মাইরী ॥

ইমন ভূপালি।

গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে। (সখিরে)
রাধা রাধা রাধা বলে কত ডেকেছে আমারে—
বনমালা বাঁশরী তার ফেলে গেছে দ্বারে ॥

সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমায়ে প'ড়েছিলাম,
তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম ;—
হায় কি করিলাম, মরমে তার ব্যথা দিলাম,
কে এমন সুহৃদ আছে এনে দেবে তারে ॥

পরজ।

কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে। (ওগো তোদের)
আপনি করেছি প্রেম, আপনি বুঝিয়ে ॥
আমি যদি করি মান, শ্যাম আমার রাখে মান,
হই হব অপমান, শ্যামের লাগিয়ে ॥

ললিত।

আমার মনটি করিয়া চুরি, আমার প্রাণটি করিয়া চুরি।
এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে, এত দিনে এলে ফিরি (গো)
কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি।
কত বার মাস কত যুগ যুগান্তের অতীতে পড়েছে ঢলি।
কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি।
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো গলে গেছে কত গিরি।
সারা জীবনে সাধে রচেছি ডোর
কোথা যাবে মোর সকল চোর
ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন আর কি ছাড়িতে পারি গো,
আর কি ছাড়িতে পারি।

ভৈরবী।

সরল মনে সরল প্রাণে প্রাণ যদি নিতে পার দিতে গো পারি।
স্বধু মুখেরি কথায় মজেছি ব'লে যেন কর না ছল চাতুরী।
হৃদয় মাঝারে আঁকিয়ে ছবি চিরদিনের তরে লুকায়ে রাখি,
নিলে জীবন বধিলে প্রাণ, পিয়াসা মিটাব দোঁহে দোঁহারি।

ভূপালী।

তোমরা বল ছাড় ছাড়, ছাড়তে কি গো পারা যায়।
ছাড়বার কথা মনে হলে, প্রাণটা আমার বিগড়ে যায়॥
দুটী কর দিয়ে মাথে প্রাণ সঁপেছি হাতে হাতে।
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সহজে কি পারা যায়॥
(দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়)

কেদারা মিশ্র।

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরমালা
মনবেদনা কব সমীরণে গগনে জানাব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব প্রাণ আর না হেরিব নর বয়ান।
সমাজ শাসনে রহিব না আর, বহিব না দুখডালা॥

—:০:—

বেহাগ—খাম্বাজ।

যাবত জীবন রবে আর কা'রে ভাল বাসব না।
ভালবেসে এই হল ভালবাসা কি লাঞ্ছনা॥

মনেরে বুঝাইব,   ভালবাসা ভুলে যাব,
পৃথিবীতে ব'লে দিব কেউ কা'কে ভালবাসে না॥

খাম্বাজ।

আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাকৃতে দিলে না।
কোন অভাগী নজরা দিলে পিরীত পোকায় কাট্‌লে
আর বাড়ে না।
বিচ্ছেদ ছুরি কে হানিলে,   আমার তারে কেড়ে নিলে,
প্রেমের ভরা ডুবিয়ে দিলে ধর্ম্মে সবে না।
আঁধার ঘরে আলো যেমন   সে আমার যে ছিল তেমন,
কুবাতাসে নিবিয়ে দিলে (ও তার) ভাল ত হবে না॥

খাম্বাজ—মিশ্র।

মাগো চিন্‌তে কি পারনি মোরে।
(আমায়) দেখেছিলি আগে রাম অবতারে॥
ভক্তিভরে দিলি মুখে তুলি ফল
হাতে হাতে মাগো তুই পাবি মোক্ষফল,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমারি সম্বল
যে যা যাচে মাগো তখনি দিই তারে
ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে (মনে পড়ে কি)
সেই ত্রেতার কথা মনে পড়ে কি, মনে পড়ে কি ?
সেই নবদূর্ব্বাদল রামরূপ মনে পড়ে কি ?

ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে, তাই
পূরিল কামনা দ্বাপরে ॥

কীর্ত্তন।

বাঁধ মা বাঁধ বাঁধ মা আর আমি পালাব না।
বাঁধা ত পড়েছি আমি কোথা যাব বল না ॥
বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে
মা মা বলে সকাতরে মুখ পানে চাব না,—
তোর প্রাণে ব্যথা দিব না, গোপালে বেঁধেছ বলে।
মা মা মা ব'লে ডাকিলে পরাণ গলে,
কত সুধা উথলে মা—তাকি তুমি জান না ॥

গৌরসারং।

কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা।
শূন্য হৃদয়-পুরী আও আও মুরারি মোহন বাঁশরী বাজা ॥
নয়ন-সলিলে বসন তিতাওল, সাধকি সাঁগর হিয়াপর শুখাল,
শিরতাজ মেরি শিরোপরি আজা ;
নয়না কো রোস্‌নি নয়না ছোড়াকে, ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে
ফাঁকে,
হা হা পিয়াবঁধু এ কোন সাজা ॥

জঙ্গলা।

নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে।
হাসিতেছে চারিদিক দিনমণি কিরণে ॥

হাসিতেছে তরুশির, হাসিছে ফুল রুচির,
সাঁতারে সমীর ধীর নীর নাচে পবনে।
কালিন্দীর কল কল, ঢেউগুলি চল চল,
জলে চলে অবিরল জলি জলি তপনে ॥

কীর্ত্তন।

হেলে দুলে নেচে চলে গোঠবিহারী ॥
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি ॥
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখিপাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীতধটি কটিতট বেড়য়ে,
নূপুর রুণু রুণু ঘুঙ্গুর ঝুণু ঝুণু,
নাচত বাজত বংশী বোলায়ত
ধীরে ফিরে চায় ধেনু দু'ধারি ॥

কীর্ত্তন।

আজ ফুলের মালায় সাজবে ভাল রাম কানু দু'ভাই।
থরে থরে আয়না রে ভাই প্রাণ ভরে সাজাইব ॥
পর ছটায় মাতবে গোকুল, দেখ বে শোভা ধরায় অতুল,
(আজ প্রাণভরে সাজাই)
চোগের দেখায় আশ মেটে না প্রাণের দেখা চাই।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই, সদাই দেখা পাই ॥

সিন্ধুড়া

এস যদি খেল্‌বে হরি নারীর সনে হোলি খেলা।
সেদিন বড় পালিয়েছিলে শাস্তি পাবে চিকণ কালা॥
বারে বারে নাগরালি, এবার ভাঙ্গবো তোমার চতুরালী,
একবার বাজাও তোমার সেই মুরলী
প্রাণ কেড়ে নাও নিঠুর কালা॥
কাল অঙ্গ রাঙ্গা ফাগে,
এবার দেখ্‌বো তোমায় কেমন সাজে,
সাজায়ে রমণীসাজে নাচ্‌বে যত ব্রজবালা।

জঙ্গলা।

ওকি হ'ল গো আমার বুঝি বা সখি (হৃদয় আমার হারিয়েছে)
পথেরি মাঝারে খেলিতে গিয়ে (হৃদয় আমার হারিয়েছে)।
একদিন সখি সকালবেলাতে,
মন ল'য়ে আমি গেছিনু খেলিতে,
মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে, পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াইতে,
সহসা সজনী দেখিনু চেয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে।
আমার কুসুম আমার হৃদয়, সহেনি কখন রবির তাপ,
আমার হৃদয় কামিনী পাপড়ী সহেনি কখন বিরহ-তাপ
চিরদিন সখি হাসিতে খেলিত,
জ্যোৎস্না-আলোকে খেলে বেড়াইত,
সহসা সজনী দেখিনু চেয়ে (হৃদয় আমার হারিয়েছে)।

জঙ্গলা।

আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে।
যেন বেড়াজালে জেলে ঘেরেছে রে।
পোড়া ঝোড়া মড়া সঝড়া,
তার ফুলধনু গুণে দিয়ে চাড়া,
(ঝেড়ে) চোখা চোখা বাণ মেরেছে রে॥

জঙ্গলা।

রূপে যার মন মজেছে তারে কি গো যায় লো ভোলা।
উঠ্‌তে গিয়ে পড়্‌বি ঢ'লে প্রেমের এইত বিষম জ্বালা॥
ভালবাসা ভুল্‌তে পারে, দেখ্‌তেও নই পাই না কারে,
যে ভালবাসা ভুল্‌তে পারে ও তার ভালবাসা ছেলেখেলা॥

জঙ্গলা (নৃত্য-সম্বলিত)।

গয়লা দিদি লো তোমার ময়লা বড় প্রাণ।
তুমি সেরেকে জল দু'সের ঢেলে দুধে ডাকাও বান্‌॥
তোমার হাত পা দোলা কোমর দোলা সার,
দোলায় নাই কিছু বাহার,
আবার কেঁড়ে থই থই অথৈ জলে ভর্‌তি কানে কান্‌॥

কেদার মিশ্র।

আজি এসেছি, আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।

আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।

আজি তোমারি চরণ তলে রাখি এ কুসুম ভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান।

আজি হৃদয়ের সব আশা, সবসুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।

ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল-জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল :
সে মরণ স্বরগ সমান।

আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব ব'লে,
আসিয়াছি তোমার নিধান ;

আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ।

ভৈরবী।

ওগো কেউ বল না ভাতার কেমন মিষ্টি
আমার শুধু হ'য়েছিল ছেলেবেলায় ছেলেখেলা করে শুভদৃষ্টি ॥
মিষ্টি গুড় মিষ্টি চিনি আর মিষ্টি মধু,
কিসের মত মিষ্টি হ্যাগো সাতটী পাকের বঁধু
সে কি তেষ্টার জল চেষ্টার ফল
জষ্ঠী মাসের দুপুর বেলার বৃষ্টি ॥
মিষ্টি ছিল বাবার আদর, আর মায়ের কোল,
ফাগুন মাসে ফাগের খেলা, কচি আঁবে ঝোল
তার চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার নারীর ধর্ম্ম কর্ম্ম ইষ্টি।
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যার মিষ্টি ভাতার ছিষ্টি ॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

মুখটী আমার বুকে নেই তার নামটী আছে মনে।
সেই নামটী দিবানিশি ফির্‌ছে আমার সনে।
আমি উঠি বসি, যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে ওঠে, সঙ্গে বসে, সঙ্গে শুতে যায়,
নাম কত কথা শুধায় আমায়, পেলে পরে নির্জ্জনে।
নাম আমার জপমালা, জুড়ায় জ্বালা
আমার সিঁথের সিঁদুর, হাতের বালা
নাই বিরহ অহরহ মধুর মোহ নাম আলাপনে ;
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ
দেহের মিলনে।

মিস্ বিভাবতী।

বাঁয়োয়া--মিশ্র।

মাখন দিয়ে খাবি কিলো পোড়া পাউরুটী।
(আবার) হৃষ্ট পুষ্ট হবে দেহ বাড়বে নানান ভিরকুটী॥
সকাল বেলা মুখ না ধুয়ে পাউরুটী খাও মাখন দিয়ে,
পিত্তি পড়া বন্ধ হবে বাবুর মুখে শুনেছি।
গরম টগবগে জলে, দুটো ডিম দিবি ফেলে,
পাচ মিনিট বই রাখিস্‌নে কো হজমে হবে দেরি।
ডিমের লাল্‌সানি দিয়ে, পোড়া পাউরুটী খেয়ে
ঠোঁট চেটে চেটে উঠে যাবে, কায়দা এ সব বিলিতি।
উপোস তিরেস কারস্ নিকো ছেড়ে দে একাদশী।

বেহাগ--খাম্বাজ।

নূতন রাঁধুনি হয়েছি--তোদের নিমন্ত্রণ ও দিদি।
স্কুলে গিয়ে বই পড়ে পড়ে ফোরন দিতে শিখেছি॥
সকাল থেকে ছুটে ছুটে, তরকারী নিয়েছি কুটে,
কিসের সঙ্গে কি দিতে হয় ঐটে ভুলে গিয়েছি॥
রাঁধতে গিয়ে শাকের ঘণ্ট, হল্যাম ভারি লণ্ড ভণ্ড,
নুন না দিয়ে দিছি চিনি মাইরি মাইরি ছি॥
রেধিছি অম্বল বিষম গণ্ডগোল
অরুচি হয়ত থাকবে নাকো নিমপাতা বেটে দিছি।
রাধতে রাধতে একটু একটু চেখে দেখেছি॥

বাহার মিশ্র।

শাউড়িতে মেরেছে ঠোনা শ্বশুরবাড়ী যাব না।
ননদেতে ভেংচি কাটে চিম্‌টি কাটে একজনা॥
বল্‌তে দিদি লজ্জা করে, খোঁপা নাড়া দেয় গো বরে,
সোহাগ ক'রে দাড়ি ধ'রে বলে কওনা কথা কওনা॥
আমি দিদি বিয়ের ক'নে কইতে কথা তারি সনে
পারি দিদি, বল্ দেখি তুই একি কাণ্ডকারখানা॥
বাবা আমায় এবার যদি, শ্বশুরবাড়ী পাঠান দিদি,
কেঁদে মা'র ধর্‌বো আঁচল প্রাণ থাক্‌তে ছাড়বো না॥

খাম্বাজ।

দিনে দুপুরে আলোকে আঁধারে তোমা ধনে কেন পাই না।
তোমারি বিরহে সদাই বিরহে ছানাবড়া ছাড়া খাই না॥
কত জোরে ডাকি কোথায় বঁধুয়া ক্ষুধায় কাতরা দাওহে রাধিয়া,
বাট্‌না বাটিয়া কুট্‌না কুটিয়া কানায়ে ঠেলিতে চাই না।
যবে হ'তে তুমি গেছ হে চলিয়া বিরহ উঠেছে জোরে জাগাইয়া
বিরহের পালা পাছে হয় বলে থিয়েটারে আর যাই না॥

বিনোদিনী দাসী (পট্‌লা)।

গজল।

যত দিন প্রাণ এ দেহে রহিবে,
আমি তোমারি তুমি আমারি।

যদি না আস ভাল না বাস
তবু তোমারি তবু তোমারি।
যে দিন হ'তে তোমারে হেরেছি,
সে দিন হ'তে প্রাণ সঁপেছি,
হৃদয় মাঝারে ছবি এঁকেছি,
ছবি তোমারি, ছবি তোমারি।
যে জ্বালায় জ্বলে মম অন্তর,
নিশি দিন নাথ জানাব কত তার,
হৃদয় মাঝারে চাহিয়ে দেখি
মূরতি তোমারি মূরতি তোমারি।

ভৈরবী।

একটা কথা বল্‌বো রে প্রাণ মনেতে সাধ আছে
অনেক দিনের পরে বিধি মিলায়ে দিয়েছে
দয়া করে এস যাদু আমার এখানে,
রাখ্‌ব তোমায় যতনে,
ফুলের মাঝে রাখব তোমায় যত ফুল ফুটে আছে॥

স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী।

বাঁরোয়া পিলু—কাওয়ালী

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে।
যারে না হেরিলে সখি নিরন্তর ঝরে আঁখি
নয়নে নয়নে রাখি নয়নের ধনে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ধীরে ধীরে তীরে কর পার।
আমরা গোপেরি নারী না জানি সাঁতার॥
তরী করে টল মল, পসরাতে উঠে জল,
মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার।

হাম্বির—কাওয়ালী।

তারে ভোলা হল একি দায়!
আমার প্রাণ যায়।
কিক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়।
বিমল জোছনা মাখা, চন্দ্রিমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী প্রাণ জুড়ায়॥

খাম্বাজ—খেমটা।

চাইনা, চাইনা, চাইনা রে তোর ওজর করা ভালবাসা।
সিন্ধুসম ভালবাসা, বিন্দুতে কি যায় পিপাসা॥
ভালবাসা পাকা সোনা, ভাল বাসায় খাদ মেশে না,
ভালবাসা বেচা কেনা, ভরডুবি করে আশা।

শ্রীমতী দেববালা দাসী (দেবী) এমেচার।

ভূপালি।

চলেনা চলেনা শ্যামা তোমা বিনা দিন আমার চলেনা।
(মা)তোমা বিনা মম আপনার জন, হিত কথা কেহ বলে না।
জীবন তরু শুষ্ক হয় মা গো, তোমা বিনা সে'ত বাঁচে না ;
আমার জীবনের সম্বল তব কৃপাবল বিনা শুভ ফল ফলে না॥
(মা) তোমা ভিন্ন আমার জীবন অরণ্য,
সেথায় প্রেমের আগুণ জ্বলে না,.
আমার অসুর সমান রিপু বলবান,
আমার কথা কেহ শোনে না ;
(মা) তুমি না হ'লে প্রসন্ন, এক মুষ্টি অন্ন,
এ সংসারে কই মিলে না,
ওমা কহে অকিঞ্চন তব শ্রীচরণ,
বিনা গতি মুক্তি হবে না॥

বেহাগ।

শ্যামা জগদীশ্বরী কখন শঙ্কর বামে কখন রাসরাসেশ্বরী॥
অগতির গতি দায়িনী ভবদুঃখ বিনাশিনী,
তারো এ ভব তারিণী, দেবী তব কিঙ্করী॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কি চোখে শ্যাম আজি তুমি আমার পানে চেয়েছ।
কত যেন প্রেমসুধা প্রাণে ঢেলে দিয়েছ॥
জুড়াইতে মর্ম্মব্যথা, হৃদয়ের কত কথা,
বলেছি তোমারে কালা তুমি তো তা শুনেছ।

ভৈরবী।

খেতে মধু বঁধু শুধু হেথা এসেছে।
অনুরাগে তাই আগে ভাল বেসেছে (কালা)॥
কোন দিন তো এমন সাজে,
আসেনি সে কুঞ্জ মাঝে,
দূরে থেকে চোখে দেখে, ফিরে গিয়েছে (কালা)
আজি দেখি লীলাবেশে, কাছে এসে ভালবেসে,
সোহাগেতে হৃদয়েতে তুলে নিয়েছে (কালা)॥

আসোয়ারি।

বুঝিতে পারি না তারা এ কেমন মা তোমার ধারা
কেঁদে কেঁদে হই মা সারা তবু তোমার পাই না সাড়া
ভবের মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে দেখলি না একবার চেয়ে
মরি গো মা ভবভয়ে তরাও গো মা ভবদারা॥

ভৈরবী

শ্যামা কি আছে আমার ভবে।
যা ভাবি আমার যা দেখি আমার
সকলই তোমার তোমারই রবে।
সুখ দুঃখ তারা যা ভাবি আপন
সে সবই তোমার তোমারই স্বজন,
সকলে তো নহে পাগল এমন
তোমার বোঝাটি নিজে বহিবে॥

মিস্ গহরজান।

খাম্বাজ—যৎ।

নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারই!
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারই।
লাজ নয়নে চকিত চাহনি, সে যে বিষম দায়,
যৌবন বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারই।
আর কত স'ব বল, তোমারই বিরহানল,
কতদিন ভালবাসা, লুকাই তোমারই।

গৌরী (একতালা)

হরি ব'লে ডাক রসনা (এই বেলা রে)
আর এমন দিন পাবে না হে।
কর হরি ধ্যান, পাবি পরিত্রাণ,
তবে কেন ভুলে রইলি।
হরিনাম আর না নিলে মন,
তবে কিসে তরিবে—
(ভবসিন্ধু পারে কিসে যাবে)
ওরে আমার মন, তবে
কিসে ভব-পারাবারে যাবে।

মিস্ গোবিন্দরাণী বাঈ।

ভৈরবী।

ভালবাসি বলে কিরে আসিতে ভাল বাস না।
আপন করম দোষে না পুরিল বাসনা॥
হেরে তব মুখ শশী, সুখ-সাগরে ভাসি
তাই বুঝি রেখেছ দাসি ভাবিতে তব ভাবনা॥

আশোয়ারী।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে ভালবাস যারে।
পরশনে ম্লান হবে হীরা কণ্ঠ হারে রে॥
ধ্যানে দরশন কর, সেইরূপ নিরন্তর,
দেবত্ব রবে না আর ছুলে তব দেবতারে।

গারা।

আমি না কেন ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী॥
বাস কি না বাস ভাল, আমি ভাল বেসে
থাকি ভাল, হইল আশা বিফল, আমি
নিরাশা সাগরে ভাসি॥

ভৈরবী।

আমি সব চিরদিন তব পথ চাহি।
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই॥

অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব প্রাণ,
ভাল বেসেছিলে জানি, মনে, শুধু রবে তাই।
আমি তবু তব লাগি, দিবানিশি রব জাগি,
এমনই যুগ যুগ জনম বাহি॥

———

মিস্ ইন্দুবালা (এমেচার)

ইমন।

তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে
এস হে এস হে।
আমার দলিত হিয়ায় পরতে পরতে
তুমি ব'স হে তুমি ব'স হে।
ব'স হে ব'স হে॥
পাতিয়াছি হেথায় রতন আসন
রচিয়াছি দেখ কুসুম শয়ন,
কত অভিলাষ কত আকিঞ্চন, নয়নের কোণে তুমি
একবার চাহ হে, একবার চাহ হে।
পিক-মুখরিত অলি-গুঞ্জরিত মন্দ-মলয় সমীর-সিঞ্চিত
হে প্রিয়সুহৃদ, হে চিরবাঞ্ছিত বারেকের তরে তুমি হাস হে
তুমি হাস হে, হাস হে॥

———

জঙ্গলা।

ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধব না'ক আজকের সাঁজে।
ভিড়িয়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে।

ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে জলটী যেথায় ছুঁয়ে আছে,
আজিও সে ঐ ঘাটেতে পল্লী-বালার কাঁকন বাজে॥
মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা দিচ্ছে ডেকে।
প্রাণের ছোট দিপটী তথায় বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটী গৃহ হেথায় কি না
আমার ছিল বড়ই চেনা—
আজও তাহার ছবিটী আমার হৃদয় মাঝে সদাই রাজে॥
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে এমন সময় আমার প্রিয়া
যেত ছোট কল্‌সিটীকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া
সোহাগে জল উথলে উঠি,
পড়ত তাহার বক্ষে লুটি,
পথে প্রিয়া আমায় দেখে ঘোম্‌টা দিত হর্ষলাজে॥
ঐ নদীর ঐ কূলে তটিনীর ঐ কোমল কোলে
দিয়াছি সেই স্বর্ণ-লতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজিও সে চিতার পরে শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তার দেখা দেয় যে সকল কাজে॥

———

কানেড়া—মিশ্র।

ধরহে বারিদ মিনতি মোর।
ডেকোনা গভীর গরজে ঘোর॥
শিহরে প্রাণ কাঁপে থর থর,
ক্ষীণ শরীর আমার হে,

ভুলে যা চপলা-চমক চাহনি,
চোখে চেপে রাখ ভীষণ বাজ,
তুইও ঘুমালে ভারত ঘুমাবে,
ভয় ঘুমাবে আমার হে।
ঘর পবন আর ভেঙ্গো না দীনের কুটীর হে॥

মেঘ।

হের সখা গভীর মেঘদল গরজে।
বাজে বাজে দূরে থেকো না থেকো না দূরে,
চাহি চুমিতে মুখ-সরোজে॥
চমকে ডাকি চমকে চমকে লুকি চপলা মন উতলা;
নীরদ ঝরিছে ঝর ঝর ঝর কিবা বাজে।
ঘন ঘন গভীর গরজে॥

আড়ানা বাহার।

(ও তার) পথে যেতে যেতে বাঁশী শুনেছি।
সে যে কালোসোনা জানি না চিনি না,
কি করি বল না প্রাণ সঁপেছি॥
রে এনে দে সজনী,
কাঁদিতেছে প্রাণ দিবস রজনী,
নিপট মিঠুর লোকমুখে শুনি,
অবলা জানি না তাই ভাল বেসেছি॥

কাফি।

সর সর সুন্দর শ্যাম আমি বারি ল'য়ে চ'লে যাই!
রাধা যে চরণে বাঁধা শ্যাম তাও কি তোমার মনে নাই॥
কৃতার্থ যে পদ পেলে সাধে কি শ্যাম
তোমায় যাই হে ভুলে,
আমার চারিধারে অরি ফেরে শ্যাম
সদাই মনে ভয় পাই।
সাধ মেটে না তোর সঙ্গে থেকে,
সদাই ভয় কোথায় দেখে,
আমার ঘর ভাল শ্যাম নিরাপদে
সেথায় হৃদে তোমায় দেখতে পাই॥

ঝিঁঝিট মিশ্র।

আহা কত অপরাধ করেছি আমি চরণে তোমার মা গো!
তবু কোল-ছাড়া মোরে করনি, কখন ফেলে চলে গেলে না গো,
আমি চলিয়া গিয়াছি "আসি" বলে
তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখি জলে
কত আশীষ করেছ বলেছ "বাছারে, যেন সাবধানে থেকো;
আর পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণভরে 'মা মা' বলে ডেকো।"
যবে, মলিন হৃদয় তপ্ত লয়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত।
করিয়াছি পাপ বলিয়াছি "মাগো ক্ষমা করে পায়ে রেখো"
তুমি মুছি আঁখি জল বলিয়াছ "বল আর ওপথে যাব না কো"

যবে পড়িয়াছি পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন করুণ নয়নে
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি মা তবু নাহি রাগ।
আমি বুঝি বা না বুঝি দেখি বা না দেখি
তুমি সতত শিয়রে জাগো।

ভৈরবী।

মায়ের চরণ তলে ঠাঁই লব,
আমি অসময়ে কোথায় যাব।
ঘরে জায়গা না হয় যদি,
বাইরে রব ক্ষতি কি
মায়ের নাম ভরসা করে
উপবাসী হয়ে রব।
প্রসাদ বলে ওমা আমায়
বিদায় দিলে নাহি যাব,
দুই বাহু প্রসারিয়া
তোমার চরণতলে প্রাণ তেজিব।

খাম্বাজ।

(তুমি) যেয়োনা যেয়োনা ব্রজেরি ললনা,
জল আনিবার তরে,

শ্যাম নবঘনে হেরিলে নয়নে
(তুই) ফিরিতে নারিবি ঘরে।
অধরে মুরলী মধু প্রাণে ভরা,
সুন্দর সুঠাম-প্রাণ মন চোরা,
পীতবাস পড়া শিরে শিখি চূড়া,
ফেরে সে যমুনার কিনারে।

জঙ্গলা।

বড় নেশায় পড়েছি শ্যামের বাঁশীতে,
বারে বারে বলি এসনা এসনা,
এসনা এসনা বাঁশী বাজাতে।
চমকে চমকে উঠি যদি, শুনি তার বাঁশী,
ডাকে রাই, অমনি ছুটে যাই,—
ঘরে থেকে কিবা হবে, ভেবে ভেবে প্রাণ যাবে,
থাকি সয়ে থাকি—,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে।

রামপ্রসাদী।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে,
মায়ের রাঙ্গা চরণ ছাড়া রে মন,
কোন তীর্থ আর কোথায় আছে
দ্বারকা মথুরা পুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথায় লীলাকারী লীলা করেছে,

সেই কৃষ্ণ জন্মে যখন, কংস যায় বধিতে জীবন,
মা যোগমায়া রূপ ধরে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, নিষ্পাপ হয়েছে,---
প্রসাদ ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই সোনার কাশী,
সে নিজে হয়ে শ্মশানবাসী, আমার মায়ের চরণ সার করেছে।

ভীমপলশ্রী।

আমি তোর আসামী নইরে শমন,
মিছে কেন কর তাড়না।
শমন শোন রে নির্য্যাশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর ধারি কিছু ধারিনা॥
জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা,
তোর ধার ধারনা।
ক'রে মহাবীজ হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারী যেতে হবে না॥
দেখ্‌গে চিত্রগুপ্তের কাছে, যে যায় বাকী আছে,
তুমি আমার নাম তা'তে পাবে না
আমি দুর্গাপুরনিবাসী, এখানে নাই নিরিখ বেশী,
নাইক তশীল যাতনা॥
রামপ্রসাদ কয় তৃণ তৃণ
আর কখনো হেথায় এসো না।

তুমি এসেছ এখানে আমার মা যদি তা শোনে,
তোমার অপমানের বাকী রবে না।

মিস্ জহরমতী দাসী।

হাম্বির।

আর কত দিন থাক্‌ব হরি
একা আমি শূন্য ঘরে।
শূন্য এ হৃদয় আসন
যতনে বসাব কারে॥
একা কাঁদি, একা হাসি, একা চোখের জলে ভাসি;
চোখের জলে গাঁথা মালা পরাই হরি তোমারে॥

মিস্ ষোড়শী দাসী।

দাদ্‌রা।

আবার বল আবার বল শুনি কেমন সে চিকণকালা।
শুনেছি তার দৃষ্টি ভালো দোষের মধ্যে একটু কালা॥
সকল কথা শুনতে না পায়,
সকল কথা শুনতে না চায়,
না চাক্ যখন মুখ পানে চায়,
(আমার) জুড়িয়ে যায় সকল জ্বালা।

ইচ্ছা জাগে মাঝে মাঝে,
কাটাই কাল তাহার কাজে,
ঘটে না তা লোক লাজে,
(আমার) ঘুচলো না তাই মনের জ্বালা ॥

কনক সরোজিনী।

কেন মজায় অবলা একি জ্বালা ॥
শঠের শিরোমণি চিন্তামণির চিন্তে,
শরীর করিলাম কাল—
বোঝেনা বেদনা সহেনা যাতনা,
জানিনা কেন করে ছলা, একি জ্বালা

কালেংড়া।

(তুমি) বলো গো তারে সই।
সে কালা আমার নয় আমি এখন তার হই।
রাধা বলে বাঁজায় বাঁশী, কাঁদে সব ব্রজবাসী,
ননদিনী সর্ব্বনাশী, আমি দ্বিগুণ জ্বালা কারে কই ॥

—০—

মিস্ কিরণময়ী (এমেচার)

বেহাগ।

কত লুকান মরম ব্যথা, কত অজানা
মনের কথা ফুটে উঠে উজ্জ্বল নয়নে।

কত রাগ বিরাগ, কত মান সোহাগ,
কত কম্পিত চুম্বন, লাজ আনত আননে ॥
কত নিশি জাগরণে, কত হিয়া শিহরনে,
কত মধুর স্বপন তাহার বিহনে ॥

মিস্ সত্যরাণী

আড়ানা বাহার।

এস হে পরাণ বধুয়া।
হৃদয় দেবতা তুমি হে আমার
পূজিব পরাণ ভরিয়া ॥
নয়নাসারে চরণ ধুইয়ে,
মুছাব যতনে কেশপাশ দিয়ে,
প্রেম কুসুম লয়ে, আছি হে দাঁড়ায়ে,
অন্তর হ'তে নাবিয়া ॥

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী।

ভৈরবী।

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে "না, না, না";
যত বলি "নাহি রাত, মলিন হয়েছে বাতি।
মুখপানে চেয়ে বলে "না, না, না ॥"

বিধুর বিকল হ'য়ে ক্ষ্যাপা পবনে,
ফাগুন কাঁদিছে হাহা ফুলের বনে,
আমি যত বলি "তবে, এবার যেতে হবে",
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে "না, না, না, ।"

জঙ্গলা ।

সখি নিজে না বুঝিলে তোরে বোঝান দায় ।
তবে কেন মিছামিছি কাঁদিয়ে কাঁদায় ॥
কাঁদিলে মিটিত যদি, কেঁদে বহাতাম নদী,
আমার আশা ছিল যে অবধি চেয়েছে বিদায় ॥
ভেবেছিনু মনে মনে এ ফুল ফুটিবে বনে,
মিশিয়া শিশির সনে ঝ'রে বসুধায় ॥
নিশীথে অপরে এসে নিল প্রাণ ভালবেসে,
আগে না বুঝিলে শেষে প্রমাদ ঘটায় ॥

হাম্বীর মিশ্র—যৎ ।

মন যে নিল সে ত আর ফিরে দিল না ।
জনম ফুরায়ে গেল, আর দেখা হ'ল না ॥
তাহারে হেরিলে সই মুখপানে চেয়ে রই,
বলি বলি মনে করি, আর বলা হলো না ।
নিশীথে ঘুমায়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি,
ইচ্ছে হয় যে হৃদে রাখি, আর দেখা হলো না ॥

—:০:—

নরসুন্দরী দাসী (নরী) ।

বিল্বমঙ্গল ।

আমায় নিয়ে বেড়াও হাত ধ'রে ।
আমি যেখানেই যাই সে যায় পাছে,
আমায় বল্‌তে হয়না জোর ক'রে ॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে কাঁদ্‌লে কাঁদে কতই রাগে আদরে ।
আমি জান্‌তে এলাম তাই
কে বলে রে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিথ্যা দেখ্‌না চেয়ে, কচ্ছে কথা সোহাগভরে ॥

বেদৌরা ।

এস, প্রাণ এস, হৃদয় আবরি তোমায় রাখি হে ।
এস, নিধি এস, আরো কাছে এস,
আঁখি পাশে এস, নয়ন ভরি দেখি হে ॥
এস প্রফুল্ল ফুলদাল সঙ্গ,
মলয় মারুত শত সঙ্গ,
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবন সনে রাখি মাখি হে ॥

যাদুকরী ।

কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে ।
কে যেন পাছে আসে ছম্ ছম্ করে গো—
পারিনে একলা শুতে ॥

নব যৌবন যবে ফোটে, কোথা থেকে কত ভূত জোটে,
ফেরে পাবার আশে আশে পাশে, আগু পিছুতে ॥
বেহ্ম দৈত্য লুকিয়ে দেখে
চ্যাংড়া ভূতে চিঠি লেখে,
আর গলায়-দ'ড়ে জ্বালায় বড় আসে গুতুতে ॥
ভূতের ভেতর আছে বড় লোক,
এত বড় জিবখানা তার অতি ছোট চোখ,
গঙ্গা ময়রা হার মেনে যায়, সে যে পায়না কিছুতে ॥
আছুরে আব্দেরে ভূত,
প্যান পেনে ঘ্যান ঘেনে ভূত,
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে কাছে আসে চায় বিছানা ছুঁতে।
নাকে কথা কয় পড়ে বোধোদয় আমায় দেয়না ঘুমুতে ॥

রাণা-প্রতাপ।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে ॥
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি ছবি প্রাণে বাজে
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
এ মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,
কেন রঙে পিছে পড়ি পাপবাঞ্ছা পরধনে ॥

বারোয়াঁ মিশ্র—মধ্যমান।

আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা,
কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়ত হি হাম।
আপন শির ময়ে আপন হি কাটনু,
কোন কামসে তেয়াগিনু ধাম ॥
ধরম করম সরম ভরম
সব হি দিনু পানিয়ামে ডারি ;
পিয়ার নাগর নটবর শেখর,
রহল কাঁহাসে জান কিয়া ঠাম ॥
রোয়ত রোয়ত ধোয়াত
অবহু জপতঁহি নাম ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন কেন কেন যারে নাহি পায়।
উচাটন মন প্রাণ ধরিবারে চায় ॥
রবি বিরাজে আকাশে, কমলিনী জলে ভাসে,
কি আশে সে হেসে হেসে ভানু পানে চায়,
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী শেষে হয় ॥

কিছু কথা

সে বহুদিন আগের কথা, প্রায় সত্তর আশি বছর হবে। গান তখনও সঙ্গীত অর্থে এখনকার মতো ব্যাপকভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েনি। বিশেষ বিশেষ পাড়ায়, সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে তখন গানের প্রচলন। যে বিশেষ শ্রেণীর ও সমাজের মানুষেরা গানবাজনা করতেন তাদের কণ্ঠ বহু চর্চায় সুখশ্রাব্য হলেও গানের কথায় দৈন্য ছিল বড় প্রকট। তখনও রবিবাবুর গান রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে ওঠেনি বা অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল পাননি কাঙ্খিত গুরুত্ব। অন্যান্য গানের মতই চলছিল এঁদের গান গাওয়া। কখনও বাণীর স্বাধীনতা নিয়ে কখনও সুরের স্বেচ্ছাচারে। গানের বাণী ও সুর কিভাবে বদলে যেত তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত 'তোমারি গেহে' হয়েছে 'তোমারি গৃহে' এবং বদলে গেছে তার সুর। ব্যবহার করা হয়েছে 'খাম্বাজে'র পরিবর্তে সম্পূর্ণ অন্য রাগ 'জঙ্গলা'। পরিবর্তন করা হয়েছে অল্প হলেও 'ও যে মানে না মানা' গানটির সুর। নির্মম প্যারডি করা হয়েছে বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রগীতি 'আমি সারা সকালটি বসে বসে' গানটির।

যাঁরা গাইতেন তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে ছিলেন বর্তমান যুগের সঙ্গীতশিল্পীদের চেয়ে কণ্ঠসম্পদে অধিক ক্রিয়াপর। অভাব ছিল কেবল যথার্থ শিক্ষার, যার জন্য তাঁরা এসব গানের যাথার্থ অনুধাবন করেননি। গুরুত্বই বোঝেননি এসব গানের বাণীমাহাত্ম্যের। তাঁরা অন্যান্য লঘু গানের মতই এ গানগুলিও গেয়ে গেছেন। রেকর্ড'ও বের হয়েছে একের পর এক।

এই সময়ের সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল জানাবার জন্য ছাপা হল কিছু গান, যা নানা সময়ে রেকর্ডবদ্ধ হয়েছিল। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হলেও কোন কোন সংগ্রাহকের কাছে যা এখনও রয়ে গেছে। অবিকৃতভাবে সেই গানগুলির মধ্যে নির্বাচিত কিছু গান এখানে ছাপা হল। সঙ্গে ছাপা হল, যাঁরা গাইতেন তাঁদের কয়েকজনের ছবি। এঁদের মধ্যে 'আঙুরবালা' ও 'ইন্দুবালা' আমাদের পরিচিত হলেও অন্যান্যরা প্রায় ঢেকে গিয়েছেন অপরিচিতের কুয়াশায়।

বিশ্ব সঙ্গীত

সঙ্গীত-সাহিত্য-রসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণ-হীনঃ।
কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।

ভূতপূর্ব্ব "রঙ্গভূমি" পত্রিকার সম্পাদক
শ্রীবৈদ্যনাথ বসাক
সম্পাদিত

বসাক এণ্ড কোং কলিকাতা

১৩৩৪

মূল্য দেড় টাকা] [বাঁধা দুই টাকা

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সার সার গ্যাসবাতি আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে।
আলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিক। বাবুদের সদ্য ঘুম ভাঙছে।
দিবানিদ্রার অবসানে হাঁকডাকে চারিদিক সন্ত্রস্ত। বাড়ির বউদের
সাথে হয়ত দিনের প্রথম ও শেষবার দেখা। অভিসারে
যাবার সময় এগিয়ে এল। আজ যেন কোন পাড়া। ক্রমাগত স্মৃতি
হাতড়ান যে কোন উপপত্নীকে আজ খুশি করার দিন।
রাত্রের আসরের তোড়জোড়। চাকর ধুতির পাড়
ছিঁড়ছে। গলায় সোনার হার পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে।
কিসের গন্ধ?
ল্যাভেন্ডারের না!

গলিতে গলিতে জেগে উঠছে শাড়ির খস্ খস্, অন্ধকার
বিক্রির প্রস্তুতি। যুঁইফুলের ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালার
ঠুংঠাং, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, কলকাতার বিশেষ বিশেষ
পাড়ায় আর একটি ক্লান্তিকর রাতের প্রস্তুতি।

এভাবেই পিছোন। একশ কখনো বা দেড়শ বছর। জানতে ইচ্ছা
করে কি সেই যুগের গানের ভাষা, কথা বলার ঢঙ্।
কত বিচিত্র বিষয়ে গান? তার অল্প কিছু নিবেদন করা হল
আপনাদের জন্য, 'বিশ্বসঙ্গীত' বই থেকে। দেখুন
ভালো লাগে কিনা।

(সৌজন্য - রন্তিদেব মৈত্র)

ব্যক্তিবিষয়ক সঙ্গীত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জয়জয়ন্তী — একতালা

কি লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়।
বহুদর্শী বিজ্ঞ, পুণ্যবান্ প্রাজ্ঞ,
দয়ার সাগর, সাগর দয়াময়।
ব্যুৎপন্ন-কেশরী শাস্ত্র-সংস্কারে,
সমতুল্য ব্যক্তি মিলে না সংসারে,
সর্ব্ব-শাস্ত্র-বেত্তা, সুপারগ বিচারে,
মহাকবি কাব্যে মহোদয়।
অসম্ভব এত গুণ একাধারে;
বুদ্ধিতে বোধ হয় বৃহস্পতি হারে,
প্রাণপণে যত্ন পর-উপকারে,
অতি সাধু সরল হৃদয়।
মহাত্মার যে সব চিহ্ন সুলক্ষণ,
সাগরের শরীরে আছে বিলক্ষণ,
কলঙ্ক রহিত পৃথিবী পূজিত,
প্রশংসাই যাঁর সমুদায়।
সৎপথের পথিক, সৎকর্ম্মে রত,
বিদ্যাবীজ বপনে আছেন অবিরত,
বিধবা বিবাহে ব্রহ্মাণ্ড-বিখ্যাত,
অনেকে পেয়েছে পরিচয়।
স্বদেশের সদাই উন্নতি-সাধনে,
বসাইবে নরে সুখের সোপানে,
এই বাঞ্ছা কেবল করেন মনে মনে,
কিরূপে কি কৌশলে হয়।
ঘুচাইতে দেশের যত কুসংস্কার,
বিপ্লব করাতে কুৎসিত ব্যবহার,
উপদেশচ্ছলে গ্রন্থ সব প্রচার,
ক'রেছেন যা আর হবার নয়।
পুস্তকে মাসিক যে টাকাটা আয়,
দানে অন্নদানে প্রায় সব যায়,
নিজ অশনে বসনে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়,
নিতান্ত যা নৈলে নয়।

কত স্থানে কত দরিদ্র সন্তান,
বিদ্যালয়ে থেকে হ'তেছে বিদ্বান্,
স্কুলের বেতন করিছেন প্রদান,
আনন্দিত হ'য়ে অতিশয়।
অসুখের বৃত্তি ভেবে পরাধীন,
পূজনীয় পদে দিয়ে রিজাইন,
কালযাপন করিলেন থাকিয়ে স্বাধীন,
হ'য়েছেন সুখী সুনিশ্চয়।
মুক্তকণ্ঠে প্যারী কবিরত্ন বলে,
বঙ্গবাসিগণের বহু পুণ্যফলে,
যশস্তম্ভ রাখিতে ভূতলে,
বঙ্গাকাশে ঈশ্বর চন্দ্রোদয়।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

এম্প্রেস ভিক্টোরিয়া—রাজভক্তি সূচক গীত

তোমার রাজত্বে নমস্কার।
মা ভিক্টোরিয়া দেবি তুমি দয়ার আধার।
পুত্রসম প্রজা পালো, দিয়েছ গ্যাসের আলো,
বৈদ্যুতিক আলো আরো অতি চমৎকার।
ছ মাসের পথে থাকি, ইচ্ছামত তত্ত্ব রাখি,
নিমিষে নিমিষে শুভাশুভ সমাচার, —
তারযোগে পাই সব, কি বলিব আর! জলে চলে কলের জাহাজ,
আবার রেলপথে, বাষ্পরথে, সাধি কত কায।
দূরবীণে গগনে ইন্দু, অনুবীক্ষণেতে হেরি বারি এক বিন্দু,
আছে চাঁদে জল, জলে পূর্ণ কীটাণু অপার।
ডাক-ঘরে কত উপকার, ক'রেছ মা ওষধিতে নারিব তব ধার।
জড় বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি, সভ্যতার বড় বাড়াবাড়ি,
দয়া সত্য সরলতা, বিশ্বাস ন্যায়পরতা,
কোথা চ'লে গেল মন করিয়া আঁধার।
পতি কোল ছেড়ে গিয়ে সতী, মনসাথে ভজে উপপতি,
সোণার ভারতভূমি হ'ল কি আবার!
বিলাতের কথা কান পেতে শোনা ভার।

গরু সব গেল ফুরাইয়ে, চাষ বাস চলে কি করিয়ে,
দুগ্ধ বিনা মরে শিশু রোগী বৃদ্ধ আর।
কি আর বলিব বাড়া, অন্ন বিনা ছন্নছাড়া,
ক্ষুধায় হইয়া সারা, মরিল সংসার।
বিধির বাণিজ্য ফাঁদে, প'ড়ে সব প্রজারা কাঁদে,
টাকার পুঁটলী বাঁধে, উকিল মোক্তার।
গোদের উপরে বিষফোড়া বারিষ্টার।
দেখ বিচার আলয়, থাকে কসাই নিচয়?
যথা গেলে সর্ব্বস্বান্ত প্রাণান্ত ব্যাপার,
বলিহারি সব মিলে রাজত্বে তোমার।
সুরাবিষ করি পান, গেল রে সব ধন প্রাণ,
তোমার টাকার টান, নিকাশে কি পাবে পার।
বলি গো, নিকাশে কি পাবে পার।

— দুর্ম্মুখ নন্দী

কালীপ্রসন্ন সিংহ

সবেরী—একতালা

দেশহিতৈষী কালীসিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর,
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যজে মানুষ-কলেবর।
আক্ষেপ অতি অল্পকালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে, দেহ ছিল জরজর।
এত বিখ্যাত অল্পদিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখি নে,
সুযশ মহীরুহ রোপণ ক'রে গিয়াছেন বিস্তর।
ভয়ানক তুফান নীলদর্পণে, জজ ওয়েল্‌সের কোপাগুনে,
লংকে করিল রক্ষা, সমাজে অতি সত্বর।
কম লিখেছে কি হুতোমপেঁচায়, টেঁর পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ সুধরে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর।
বিষয় গেলো এই এক দোষ, বৃথা করা আপশোষ,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তরে:
মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়াছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

কেশবচন্দ্র সেন

বিভাস—একতালা

কি দিব কেশব, পরিচয় তব, ঘরে ঘরে সব, জানে তোমায়।
বক্তৃতার ভাব, নিত্য নব ভাব, মানব-স্বভাব মোহিত তায়।
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিন্যাস, প্রাণ সুশীতল সুমধুর ভাষ,
কত যে রূপক, কত অনুপ্রাস, পুলকিত চিত তব কথায়।
যথাশক্তি করি বিদ্যা উপার্জ্জন, রত শাস্ত্রপাঠে ধর্ম্মের কারণ,
ভাবুক প্রেমিক তুমি হে যেমন, তব সহযোগী দেখা না যায়।
ধর্ম্ম-আন্দোলনে, পবিত্র জীবন, যে রত এ ব্রতে সেই সাধুজন,
প্রেমে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ, পরিজনসনে মগন তায়।
কোরাণ বাইবেল পুরাণ বিধান, পাঠশেষে তব এ "নববিধান"
অনুরাগী যাহে উল্লাসিত প্রাণ, তত্ত্ব প্রেমে মত্ত কীর্ত্তন গায়।

— রাধামোহন মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

দীনবন্ধু, দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে এতদুঃখ লিখেছিলে,
বঙ্গের উজ্জ্বলমণি, কবিকুল চূড়ামণি, সেই দীনবন্ধু হায়!
কোথায় রহিলে।
যাঁহার লিপি-কৌশলে, দেখাইতে রঙ্গস্থলে,
নব নব সু-নাটক বঙ্গীয় কুলে।
লেখনী-কৌশল যার, প্রীতিময় সবাকার,
সেই দীনবন্ধু হায়! শমন-কোলে।
চির-নবীনা কামিনী, সালঙ্কারা তপস্বিনী,
ভাসে এবে অনাথিনী নয়ন-জলে।

— অজ্ঞাত

দ্বারকানাথ মিত্র

বসন্ত-বাহার—ঢিমে তেতালা

অনরেবেল জজ মিত্র মহাশয়।
হারায়ে দ্বারকানাথ ভারত-জননী,
মণিহারা যেন সাপিনী তাপিনী,
রোদন করিছে মনোদুঃখে দিবারজনী।
মলিন মুখ উজ্জ্বল, যাঁর গুণে হ'য়েছিল
সে আলো নিবে গেল হায় রে।
শিরে করে করাঘাত, বলে দ্বারকানাথ,
মুকুট মণি আয় (রে)।
বঙ্গ দ্বারকাপুরী, কোথা গেলে পরিহরি,
অসময় যাওয়া উচিত নয় (রে)।
ব্যাকুল বাঙ্গালিকুল, দুকূল জাহ্নবী কূল,
শোকে নেত্রনীর বেগে বয় (রে)।
ভাল হ'য়েছিল আশা, সে আশার গেল বাসা,
দেখে দুঃখে বুক ফেটে যায় (রে)।
যে হবে ভাল ছেলে, সেই যাবে মাকে ফেলে,
আপশোষ ধরে না ধরায় (রে)।
বোকা বাঙ্গালী নাম ঘুচালেন গুণধাম,
কে না যশ ঘোষিবে ধরায় (রে)।
ভারত-নিবাসী লোক, সবাই ক'রেছে শোক,
কবি কয় তোমার মরায় (রে)।

— **প্যারীমোহন কবিরত্ন**

(বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনোপলক্ষে)

দ্বীপান্তর গমনকালে

বেহাগ—একতালা

বঙ্গবাসী তবে যাই,
অকূল-দুঃখ সাগরে এ জীবন ভাসাই।
হা বঙ্গ-ভূমি কোথায় রহিলে, জনমের মত নবীনে ত্যজিলে
অকূল-সাগরে ভাসালে ভাসালে, উপায় না কিছু ভাবিয়ে পাই।

হায় এলোকেশী, প্রাণের প্রেয়সী,
তোমা বিনে দুঃখে ভাসি দিবানিশি,
সহাস্যবদনে একবার আসি, জুড়াও তাপিত প্রাণ।
আশা ছিল সুখে বঞ্চিব দুজনে তোমারে পাঠায়ে শমন সদনে,
কি হ'ল কি হ'ল আশা না পূরিল, মনে ভাবিয়ে না কিছু পাই।
হায়! বঙ্গবাসী করি নমস্কার, জনমের মত চলিলাম এবার।
হ'তে হবে মোর দুঃখ-সিন্ধু পার, পাব না পাব না ত্রাণ।
শমনরে মোহন্ত যাবার সময়, শত্রুতা রাখিয়ে যাওয়া উচিত নয়,
রেখো রেখো ধর্ম্মভয়, কাতরে এই ভিক্ষা চাই।

— **অজ্ঞাত**

(এলোকেশীর স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বীপান্তর যাওয়ার সময়ে)

পরমহংস রামকৃষ্ণ

গীত

(আমি) সাধে কাঁদি
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দি'ছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
(মরি) ফুল্ল ফুলহারে সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হ'ল বাদী।
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু-নয়নে বহে ধারা,
ঢোলে ঢোলে নেচে কৃতূহলে, এস গুণনিধি সাধি।
চ'লে গেলে আর এলে না, জীব ত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, দীন-হীনে পদে কর অপরাধী।

— **গিরিশচন্দ্র ঘোষ**

বাল্মীকি

ঝিঁঝিট—একতালা

অক্ষয় অমর ধরায় খ্যাতি, —
কবি-গুরু বাল্মীকি গুণধাম।
প্রণমি পদে, জ্ঞান-কিরণ, কর দান দীনে কেন বাম?
কাব্য-বিশারদ আর্য্যনায়ক, উদার-প্রকৃতি ধর্ম্ম-পালক।

কালিদাস আদি তব সেবক, সকলের সবে হ'ল পূর্ণকাম।
রচি রামায়ণ চারু কৌশলে, সতীত্ব সীতার ভাল দেখালে,
সকলের পূজ্য জগতে হ'লে, স্বজাতি বিজাতি ঘোষে নাম।

— অজ্ঞাত

বুদ্ধদেব

দরবারি কানাড়া — আড়াঠেকা

বিষ্ণু-অংশ-অবতংস বুদ্ধদেব অবতার।
জীবের দুর্গতি হেরি, আকুল হৃদয় তাঁর।
ত্যজি রাজ্য সিংহাসন, মাতা পিতা পরিজন,
ধরার দুঃখকারণ, তাপস রাজকুমার।

— অজ্ঞাত

মহারাণী স্বর্ণময়ী

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গমহিলে, ওগো পুণ্যশীলে,
দানে দেশ-কুল ভাল আলো করিলে।
সাধারণ-উপকার, করিবারে অনিবার,
অমৃত বদান্য-স্রোতে বঙ্গ ব্যাপিলে।
অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, বিদ্যাদানে জ্ঞানার্থীরে,
চিকিৎসাদানে রোগীরে, জীবন দিলে।
ধন্য তব স্বামী-কুল, ধন্য তব পিতৃ-কুল,
কূল পায় গো অকূল, তুমি কূল দিলে।
তব যশঃ পুণ্যমান, ব্যাপিল গো হিন্দু-স্থান,
অক্ষয় কীর্ত্তি সুনাম ভাল রাখিলে।
ধর্ম্মেরি পুণ্যেরি বলে, থাকবে গো সদা মঙ্গলে,
ভাসবে পরকালে চিরসুখ-সলিলে।
বঙ্গেরি ধনাঢ্যগণ, করে গো তোমার মতন,
ভিজাবে জনম ভূমি দান-সলিলে।

— গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি, হইয়াছে এতদিনে।
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কুসুমকমলে, মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব্ব তানল'য়ে, বীররসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীরনাদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলাসনে, কেলি-বিপিনে।

— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

কোথা আছ দেখ, এসে মহামতি রামমোহন,
তোমার জন্মভূমি ভারত ভূমি হ'য়েছে কি সুশোভন।
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি,
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন।
আশা তব ছিল মাত্র, বুঝিবে লোক সত্য তত্ত্ব,
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্ত হ'য়েছে এখন।
তোমায় যারা করিত পীড়ন, তাদের সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা উপহার তোমায় করিছে অর্পণ।

— দীননাথ অধ্যেতা

(* রাজা রামমোহন রায় স্মরণার্থে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই গানটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে গীত হইয়াছিল।)

লর্ড রিপণ

খাম্বাজ—মধ্যমান

জয় জয় রিপণ। বিদ্যাদীপন ধর্ম্মসমুজ্জ্বল জীবন হে।
দুর্জ্জন-শাসন, দুর্ণয়-নাশন, ন্যায়-বিধান বিকাশন হে।
জয় জয় রিপণ! কীর্ত্তি নিকেতন, রাজপুরুষ কুল-কেতন হে।
শান্ত সুশোভন, নৃপ গুণ ভূষণ, ভারত জনগণ তোষণ হে।

— অজ্ঞাত

নেশাসংক্রান্ত সঙ্গীত

(১) গাঁজা

গাঁজার গান

বাউলের সুর—একতালা

মার দম্ ক'সে দম্ গাঁজার কল্কে তুলে,
না খেয়ে র'য়েছে আমার পেট্টা ফুলে।
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই আমার বাপের কুলে।
অভাগা কপাল, কান্তা যেন কাল,
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

— অজ্ঞাত

গাঁজার সারিগান

ঝিঝিট-খাম্বাজ — পোস্তা

ওরে মাজি ভাই গাঁজার নৌকা কতদূরে যায়।
পুঁটি মাছে গান করে, চেলা মাছে তান ধরে;
ল্যাটা মাছে তানপুরা বাজায়।
বচ্চে বাতাস সো সো, জল চলে (ক'রে) ঢল ঢল,
সুয্যি পাটে ব'সে হাসে, প্রাণ গাঁজা পানে ধায়,
(মন অলি গাঁজা-মধু চায়, গাঁজার কল্কে নিয়ে আয়)
মোহন-ভোগ বাবুর মজা, মদ ফাউলে কেউ বা তাজা,
খাই সুঁটকি মাছ ভাজা, গাঁজা বিনে বুক ফেটে যায়।

কত বাঁদর আমার দেখা, গাঁজার প্রেমে হ'ল বোকা;
ছুওনা গাঁজা হয়ো না ভ্যাকা, খাক্ হ'য়ে প্রাণ গাঁজা চায়।

— অজ্ঞাত

(২) মদ

কলির প্রহ্লাদের গীত

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা

তোর নাম রেখেছি মদ্‌বোতলা।
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল না মদের ঢালা গেলা।
মদে মেখে চাটের রুটি, গড়্‌না গুঁড়ির চরণ দুটি,
আয় দু'জনে, সেই চরণে,
পরিয়ে দি নোট টাকার মালা।

— রাজকৃষ্ণ রায়

মাতালের গান

ঝিঁঝিট-জংলা—আড়খেম্‌টা

তারিণী গো মা কেন হাতির উপর এত আড়ি।
মানুষ মেলে টেরটা পেতে, তোমায় যেতে হ'তো হরিণ-বাড়ী।
সুর্কি কুটে সারা হ'তে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি;
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপ্তো তোমায় গ্র্যান্-যুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন, ছুঁতে হ'তো উকীল বাড়ী।

— অজ্ঞাত

সুরাপান

জংলা-কালাংড়া—যৎ

মরি হায় হায়।
সুরার তরঙ্গে বুঝি দেশ ভেসে যায়।
কোথা হ'তে সুরা এল, দেশ ছারখার হ'ল,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ তার পানে ধায়।
কত যুবা যুবকালে, প'ড়ে কালের কবলে,

বৃদ্ধ পিতামাতাগণে শোকেতে ডুবায়।
কত শত সাধ্বী-সতী, অকালে হারায়ে পতি,
হাহাকার রবে পূর্ণ করিছে ধরায়।
জ্বলিছে এ বিষানল, ধূ ধূ করি অবিরল,
পতঙ্গসমান লোকে তারই পানে ধায়।
পুড়িয়ে সেই অনলে, ধনে প্রাণে সদা জ্বলে,
অকালে পতঙ্গসম পরাণ হারায়।
ভারতের কি দুর্দ্দশা, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল চাষা,
অন্নাভাবে শীর্ণকায়, তবু মদ খায়।
তাই বলি এস ভাই, মদ খেয়ে কায নাই,
ভাই ভাই মিলে যাই, সাধুজনপ্রায়।
দাও তুলে খোলাভাটি, মদ ছেড়ে হও খাঁটি,
সবে মিলে কুতূহলে হরিগুণ গাই।

— অজ্ঞাত

জংলা—একতালা

খেও না খেও না, ছুঁওনা, ছুঁওনা, মদ বদ্ জিনিষ ভাই রে।
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি, মতিমান নরে করে হীনমতি,
অল্পদিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের চাঁই রে।
বিনাশে পদ, ঘটায় বিপদ, করে দুরাশয়, করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ, পাতকের হ্রদ, মদ আপদের খাঁই রে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে, কলেবর ত্যাগ করে গোভাগাড়ে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষ্মীর বাড়ে ঠাঁই রে।
অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্য-গমন, অহরহঃ অপকর্ম্মে আকিঞ্চন,
অধর্ম্ম ময়দানে করায় বিচরণ, বাছে না বলদ গাই রে।
যারে দংশায় সুরা-কাল-সাপ, কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগ ভোগে পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাই রে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল, বিষয়ে বিরক্ত কায কর্ম্মে ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল, রেগে হ'তে হয় কাঁই রে।
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে লাল, চ'লে যায় বেঁকে,
লোকে বলে মাতাল, পথে ঘাটে প'ড়ে খায় কত তাল,
ছি ছি এমন পাজি নেশা নাই রে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

বাউলের সুর—খেমটা

আসিয়ে মাদক দানব, নাশিল সব,
ভারতভূমে দেখরে তোরা।
ঐ দেখ ইডেন সৃষ্টি, খোলা ভাটী, গরীব লোককে ক'ল্লে সারা।
দেশী মদ সস্তা পেয়ে, অনেক খেয়ে, ধনে প্রাণে ম'লো তারা।
ছাড়িয়ে সকল কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, করে কেবল সুরা সুরা।
দু'বেলা পায়না অন্ন জরাজীর্ণ, বেড়ায় যেন দিশেহারা।
দেখ তাদের দারাসুত, দীনের মত, সার করেছে ভিক্ষা করা।
হায়! তাদের দেখলে পরে, নয়ন ঝরে, যেন বাপ-মা-মরা।
আবার ঐ বিলাতী মদ করিল বধ, ছিল যত বাবু-ভায়া।
সাহেবী কোর্ত্তে গিয়ে, ব্রাণ্ডি খেয়ে, হ'ল পিলে যকৃত জরা।
আহা! কি মোহে প'ড়ে, সকল ছেড়ে, মদের তরে হ'লো সারা।
মদ কিন্‌চে, বেচে বাড়ী জুড়ী, শেষে শুঁড়ির পায়ে ধরা।
মানুষকে পশু বানায়, ফেলে খানায়, আরো কত করে সুরা।
হায় হায় দেখেও কি হয় না বুদ্ধি, ছাড়ে না মদ কেন তারা।
দেখ গাঁজা চণ্ডু খেয়ে, পাগল হ'য়ে, ম'চ্চে কত গরীবেরা।
দিতেছে আফিং গুলি নরবলি, ধ'রে ধ'রে কত তারা।
আবার ত মাদক চরস, আর তাবের* রস, একবারে দেশকে
ক'ল্লে সারা।
সিদ্ধিটা বুদ্ধি-নেশে, হেসে হেসে, লোককে করে চিন্তা জরা।
তামাক চুরুট নস্যেতে হয় উদরাময়, দৌর্ব্বল্য আর মাথাঘোরা
আনিয়ে যক্ষ্মাকাশি, প্রাণটি নাশি, করে হুকুম হাসিল তারা।
হায়! পেয়ে অমূল্য ধন, মানব-জনম, খাও কেন ভাই গরল-সুরা।
এস পান করি সবে, শান্তি পাবে, হরিনাম গান-মদিরা।

— অজ্ঞাত

(* সম্ভবতঃ তালের রস)

খাদ্যবিষয়ক গান

আলু

ঝিঁঝিট—তেলেনা

আলুর সমান জিনিষ কিছু নাই।
জগৎ সংসারে ভেবে দেখ ভাই,
সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট বালাই ল'য়ে ম'রে যাই।
আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটি আঁস, ছাড়ালে সকলি শাঁস,
শীত বর্ষা বারমাস পাওয়া যায়, ঝালে কি ঝোলে অম্বলে,
যাতে দেবে তাতেই মেলে, দেবা মাত্র গ'লে যায়:
মরি কি সুতার, আর কি কব তার, এমন আলু যে না ভালবাসে,
তার ভালবাসার মুখে ছাই।
গোল গোল কি সুঠাম, যেঁন সাদা শালগ্রাম,
রাসনাম বিলাতী আলু বলে; তরকারী দলে,
যত আছে ভূমণ্ডলে, আলুর নীচে সকল শালাই ঝোলে,
দেহে বাড়ে বল, বাহো হয় সরল,
রক্ত সাফ এক হপ্তা খেলে, বিনাশে কফ পিত্ত বাই।
ভেজে খেলে যায় জলকাশী, বর্ণে হয় শশী দোষী,
বারমাস টাট্‌কা থাকে ভাই রে—মাগমরা পুরুষের পক্ষে,
এমন জিনিষ ত্রৈলোক্যে, ভেবে দেখ আর কিছু নাই রে,
খেয়ে ভাতে ভাত করে কুপোকাৎ,
প্যারী হেসে বলে, আলু যেন বিদেশে তোমায় পাই।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

খাঁটি দুধ

বাঁটের মুখে খাঁটি দুধ কে নিবি তা বল।
সের করা আধা-আধি খালি কলের জল।
মাইরি বল্‌ছি ভাই, আমার ভাগলপুরের গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর এক বিয়েনের ফল।
টাকাতে ছ'সের, দিচ্চি এই ঢের,
খেড়ো গাইয়ের গাঢ় দুধে গায়ে বাড়ে বল।
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে চ'লকে উঠে, যেন যৌবন ঢল ঢল ঢল।

— অজ্ঞাত

(মুসলমানী গীত ?)

ডাল

মূলতান—একতালা

যত রকম ডাল আছে এ সংসারে,
কলায়ের কাছে সব শালা হারে।
আ মরি কি মজা হয় গো আহারে,
টিকি ধ'রে যেন জুতো মারে।
কোথা লাগে কাম্যকুপ, কামধেনু স্বরূপ,
কল্পবৃক্ষ কল্কে পায় না করে।
খেঁসারি মসূরি মুগ অরহর ছোলা,
গরীবের পক্ষে আখাম্বা আছোলা,
ঘি মশলা না দিলে গলায় যায় না গেলা,
পাতলা হ'লে খায় না নরে!
অনাহুত অতিথি কুটুম্ব লোক এলে,
গরম গরম ফেন ডেলে ঢেলে দিলে,
যোগে যাগে দীনের দিন যায় চ'লে,
সংক্ষেপে সম্ভ্রমে সারে।
হাঁসা বর্ণ বসবাস হাঁসখালি,
মূর্ত্তিভেদে নাম যার বিরিকালী,
যার প্রতি প্রীতি করেন কালী,
মা তাই মাষভক্ত বলি খান আদরে।
দিশি ডাফরান হলুদ যাকে বলে,
জলে গুলে তার একবিন্দু দিলে,
আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হ'লে,
সে সৌরভে কে রবে ঘরে।
বাঁকুড়া বর্দ্ধমান জেলার যত লোক,
কলায় মন্ত্রে তারা বলে উপাসক,
কোন কালে কোন ভোগেনাকো রোগ,
সদা থাকে সুস্থ শরীরে।
শিলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ি,
কালিয়া কাবাব যায় গড়াগড়ি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি,
হাঁড়ি হাতে ক'রে দাঁড়ান দ্বারে।
তা'তে যদি হয় টকের মাছের যোগ,
ভরণীনক্ষত্রে যেন মূলাযোগ,

পেটে যেন ঢোকে ভস্মকীট রোগ,
সে যোগ কি কেউ মার্ত্তে পারে।
খাসির খাসা মাসে অনাটন হ'লে,
মাষকলায় তাতে গোঁজা দেওয়া চলে,
ভুঁড়ি মোটা বাবু ক'রে তুলে ফেলে,
মহাবায়ুর পিত্ত পলায় দূরে।
এমন ধারা ডেলে দোষারোপ যে করে,
কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে,
মাংসতুলা গুণ মাষকলাই ধরে,
শিব লিখিছেন তন্ত্রসারে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

পাঁঠার মাংস

কবির সুর—আড়খেম্‌টা

সদা পাপ ধ্বংস পাঁঠার মাংসেতে করে।
পাঁঠার মাংস যে জন খায় গো বারমাস,
তার পাপ থাকে না শরীরে।
শিবের তন্ত্রেতে বলে, মধুকোষ খেলে,
তার করতলে চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
ম'লে কালের গালে কালী দিয়ে, যায় কালীপুরে থাকে নিষ্কলে।
ক্ষীরোদ মন্থন-কালে সুরাসুর দলে,
সুধা-ভাণ্ড জন্য যখন দ্বন্দ্ব ঘটালে,
এ সুধা-ভাণ্ড, ছাগের অণ্ড, ঠাকুর লুকিয়েছিলেন ছল ক'রে।
গাওয়া-ঘৃত দিয়ে তায়, গরম-মশলাতে মিশায়,
অতি ভক্তি ভাবে নিবেদন করিয়ে কালিকায়,
কুসুম কুসুম প্রসাদ যে জন পায়, তার পুণ্য ধরে না চরাচরে।
যারা অর্থ জানে না, করে মাংসেতে ঘৃণা,
যে গুণ অনন্ত অনন্ত মুখে ব'লতে পারে না,
মোলে গতি হয় না, গঙ্গা পায় না সে, মাংসেতে যে দোষ ধরে।
মহাপ্রসাদে যার দ্বেষ, মহামায়া দেন তায় ক্লেশ,
ম'লে পরে মহানরকে মগ্ন হয় শেষ,
সংসারে সে পায় না সুখলেশ, চিরদিন দুঃখে মরে।

পাঁঠার মধুকোষের চাম, অতি সুন্দর সুঠাম,
যদি কেউ কুড়োজালি ক'রে জপে গৌর নিতাই নাম,
নিতাই তার নিত্য পূরাণ মনস্কাম, অন্তে অগ্রদ্বীপান্তরে।
এ বচন ছিল গোপনে, প্রচার হ'ল এত দিনে,
টীকে টিপ্পনীতে লেখা বেল্লিক পুরাণে,
কবি বিদ্যাশূন্য বেল্লিক বাগীশ, বচন দিয়েছেন প্রকাশ ক'রে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

পেটুকের গীত

খাম্বাজ—খেম্‌টা

লুচি মণ্ডা খেয়ে মনটা তুষ্ট, কিন্তু প্রাণটা গেল,
কুঁচ্‌কি কণ্ঠা এক হ'য়েছে; (বাবা) বুঝি দফা ঠাণ্ডা হ'ল।
জল রাখিবার স্থান রাখি নাই, উপায় কি বল,
উঠ্‌তে উদর ফাটে, (ও বাবা) শীঘ্র আমায় ধ'রে তোল।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তাই আমার ঘটিল,
পুরি দিয়া উদর পুরি, (ও বাবা) যমের পুরী দেখ্‌তে হ'ল।

—অজ্ঞাত

বেগুণ

জংলা—একতালা

কব বেগুণের গুণ যে কত।
গুণে সবাই বশীভূত, উচ্ছে ঝিঙে পটল কুমড়ো,
কি কাঁচকলা, কে আছে বেগুণের মত।
এমন আনাজ আর মেলে না ভূতলে,
বার মাস প্রায় সব দেশে ফলে,
ভেবে দেখ কোন্ ব্যঞ্জনে না চলে,
কেউ নয় বেগুণে বিরত।
সপ্ত গুণ মাত্র লিখেছেন নিদান,
নিদানের বোধ হয় না জেনে নিদান,
কিবা রূপবান্ বেগুণ গুণবান্ ধনের গুণ কত শত।
অল্প দামে অধিক পরিমাণে মেলে,
পীড়াদায়ক নয় পেটভ'রে খেলে,

এক গৃহস্থ কাবার একটা বেগুণ পেলে,
কিন্তু মেলে যদি মনের মত।
কাবাব হয় বেগুণে অতি চমৎকার,
সুধা লজ্জা পায় এম্নি তার সুতার,
এ জন্মে ভোলে না খায় যে একবার, হ'য়ে থাকে অনুগত।
দেবতার দুর্লভ শীতে বেগুণ পোড়া,
কে নয় জগতে বেগুণ-পোড়ার গোঁড়া,
যে না খায় সে খাক্ বাপের কলা-পোড়া,
খায় না বোধ হয় পশু যত।
আলু মটরশুটীর সঙ্গে হ'লে যোগ,
ডাল্না নাম ধরেন ভগবানের ভোগ,
ঋষির মন বসে যোগীর ভাঙ্গে যোগ, হ'য়ে থাকে পদে নত।
ঘিয়ে ভেজে যখন বেগণীরূপ ধরে,
গরম গরম যদি তোলা যায় অধরে,
লুচি ফুল্কো রুটির সর্ব্বনাশ করে, দিলে পর্ব্বত পরিমিত।
ব্যাসমেতে হ'লে তিল পিটুলি ভাজা,
গোল গোল যেন চাঁদ সই খাজা,
সাধ ক'রে খায় কত রাজা প্রজা, কিনে আনে ক্রমাগত।
গোটা চারি গাছ যার ভিটেয় হয়,
বার মাস বার্ত্তাকু তার গৃহে সঞ্চয়,
কল্প-বৃক্ষবৎ ফুরাবার নয়, ফলে ফল ভূতগত।
কবিরত্ন কয় ওহে ভগবান্, এ বর আমারে কর হে প্রদান,
বেগুণ গৃহে যেন থাকেন অধিষ্ঠান, সুখে ঝুরো লুসি নিয়ত।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

মৎস্য প্রশংসা

ভৈরবী—একতালা

মাছের মতন খাসা খাবার জিনিষ আর কিছু নাই ভূমণ্ডলে।
ঘ্রাণে পঙ্কবৎ অন্ন চলে,
কালিয়া কাবাব কোপ্তা পোলাও আদি মীন-বৃক্ষে সব ফলে।
পঞ্চম'কারেতে প্রধান মীন ম'কার,
যা না হ'লে ভোগ হয় না কালিকার,
ভগবান হ'য়ে মৎস্য অবতার, নিমগ্ন ছিলেন জলে।

ঝোলে বাসুদেবের মন ভোলে,
পুরি ফাউল কারি পাঁউরুটী বিসকুট যার নীচে সব ঝোলে।
শ্বেত রক্ত বর্ণ সুন্দর সুঠাম, রুই মিরগেল কাতলা নানাবিধ নাম,
যে না খায় তায় ভগবতী বাম, ম'লে যায় নরকানলে।
তন্ত্রে স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলে, আচার দিয়ে খেলে বাসি ইলিস মাছ,
সশরীরে স্বর্গে চলে।
মদের সঙ্গে পচা খেলে ভেট্‌কি ঝুরো,
অহোরাত্র সিদ্ধি সাধন হয় পুরো,
তার পিতৃলোক স্বর্গে সুখে নৃত্য করে, আনন্দে দু'হাত তুলে।
(বলে) বংশে জন্মেছে কি সুছেলে।
আবার টাট্‌কা এণ্ডাযুক্ত খেলে তপ্সে-ভাজা; চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে,
মোচা চিংড়ী দিয়ে খেলে ছোলার ডাল,
ভবসিন্ধু মাঝে বাঁধে পুণ্যের আল,
নির্ব্বাণ মোক্ষ তার পক্ষে শক্ত গাল, হরমুতের দাবি চলে।
কবিরত্ন কয় কৌতুকে, যেতে ইচ্ছা নাই গোলোকে,
থাক্‌বো এই ভূলোকে, চিংড়ী বারমাস যদি মেলে।
বিশেষতঃ বাংলার বাঙ্গালীর পক্ষে,
মৎস্য তুল্য দ্রব্য দেখা যায় না চক্ষে,
চক্ষে-দৃষ্টি রয়, বংশ বৃদ্ধি হয়, দেহ থাকে সবলে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

কলিকাতা বিষয়ক সঙ্গীত

কলিকাতা

গীত

মানবদেহ-কল্‌কাতার কেতা চমৎকার
তুলনা নাইকো তার।
মনে বুঝে দেখ ভাই, রতি তফাৎ নাই;
আছে তাই, গ্যাসের আলো দেখতে পাই,
করে সোণার সহর দীপ্তাকার।
হয় লালবাজারে জোর, দেখে চক্ষে লাগে ঘোর,
চিনেপাড়া চিন্‌লে পাবে ধর্ম্মতলার মোড়,
আছে ভারি মজার রাধাবাজার, শেষে স্মরণ হয় সবার।
খাসা বাজার চাঁদনী, আছে দোকান্দার ধনী,
বহু রত্ন থরে থরে, হীরে লাল চুণি,
যাবে জীবে ঠকে, দেখ্‌লে চোখে, সাধুতে করে ব্যাপার।
আছে বাজার টেরিটি, ওসে বিষম নট্‌খটি,
যাস্‌ না রে মন, করি বারণ সব হবে মাটি,
গেলে বউবাজারে পড়বি ফেরে, প্রাণ বাঁচান হবে ভার।
সেই হাড়কাটার গলি, আছে বর্ত্তমান কলি,
হাড়কাঠে ঘাড় মুচ্‌ড়ে ধ'রে দেয় নরবলি,
আছে পটোলডাঙ্গা সান্‌কি ভাঙ্গা, চোরবাগানে খবরদার।
মাথাঘসার গলিতে, যায় সবাই চলিতে,
শঙ্কা লাগে সে সব কথা মুখে বলিতে,
বাজার তালতলা থাকে না স্মরণ, মরণ কলিঙ্গের মাঝার।
খাসা লালদীঘির পাণি, বড় মিষ্টতা শুনি,
কেউ বলে ভাই লোন্তা লাগে ধর্ম্মে হয় হানি,
যে তার, তার বুঝেছে, সেই ম'জেছে, মিটেছে মনের বিকার।
চাঁপা রয় চাঁপাতলা সেই চতুরং খেলা,
নিত্য গুরু সদয় হবে সাঁখারীটোলা,
আছে ইন্টালী পদ্মপুকুরে, তিন ঘাটে তিন অবতার।
যদি বাগবাজারে যাও, ভারি ভারি কাজ বাগাও,
হরিনামের মণ্ডা কিনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও,
গেলে মুচীখোলা কল্‌টোলা নিমতলা হইবে সার।
মেছোবাজার ঠনঠনে, কথা শক্ত টনটনে,
সাম্‌লে সুম্‌লে সিম্‌লে যেও, নইলে চনচনে,

আছে মাণিকতলা সোণাগাছি, যোড়াসাকোর খুব বাহার।
সেই আহিরীটোলাতে, ভাই বাউড়ি চালাতে,
পার যদি লভ্য হবে নিত্য খেলাতে,
দুই নয়ন মুদে যাবি সিদে, সাম্‌নে পাবি শ্যামবাজার।
থাক শোভাবাজারে মজা পাবে আখেরে,
দরমাহাটা পাথুরেঘাটা বোঝ বেশ ক'রে,
হয় টেকশালাতে টাকার গঠন, সেই খানে মন! চল আমার।
বড়বাজার হাটখোলা, হয় কতরূপ খেলা,
আপন মুখে গোপন কথা, যায় নাকো বলা,
আছে হাবড়ার ধারে কলের গাড়ী, যাওয়া আসা বারম্বার।
সে নারিকেল-ডাঙ্গায়, কত রত্ন-ধন মাঙ্গায়,
কারু সপ্তচোঙ্গার বুদ্ধি ল'য়ে পোরে এক্‌ চোঙ্গায়,
ফলে হারিয়ে আসল পুঞ্জিপাটা বেলেঘাটা পায় না পার।
খুঁজে দেখ্‌লাম মুজাপুর, পাবে রত্ন-ধন প্রচুর,
বাদুড়বাগান কুমারটুলি থাক্‌তে বহুত দূর,
সেই কালীঘাটে, সিদ্ধপাটে, স্মরণ মনে নমস্কার।
আছে গঙ্গাধারে গড়, কামান পাতা থরে থর,
তার ভিতরে আছে কত রঙ্গিন্‌ রঙ্গিন্‌ ঘর,
তার দ্বারে দ্বারে অস্ত্র ধ'রে খাড়া রয় পাহারাদার।
আছে বাজার বহুতর, রাজার পোস্তা ভুরুপর,
ললাটেতে লাটের বাড়ী জিভায় জজের ঘর,
আছে কণ্ঠাতে কালেক্টার বোসে, কাছারী ক'রে গুল্‌জার।
আলিপুরের জেলখানা, মনে বুঝে দেখ না,
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ, নাই তার তুলনা,
পাবে মেডিকেল কলেজ, হিন্দু কলেজ এই দেহের হ'লে বিচার।
দেহ-তত্ত্ব পরিচয় দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়,
আজব কাণ্ড মনুমেণ্ট মূল পদার্থ রয়,
আছে চুলে চুলে চুণগলি গুণে কে করে শুমার।
এই মানব দেহখান, আছে কতরূপ বাগান,
কলকাতা তায় কোথায় লাগে ইংরাজের নির্ম্মাণ,
আছে চৌদ্দ পোয়ার চৌদ্দভুবন খোদা খোদ করে তৈয়ার।
বাজার বাহায় ধারা গলি তিপান্ন সারা
দেহের মধ্যে দেখ খুঁজে আছে ঠিক করা,
আছে যাদুঘর এই দেহের ভিতর, দেখলে মন ফির্‌বে না আর।
এই জানবাজার খাঁটি, কথা কই মোটামুটি,
ভাঙ্গবে যে দিন সোণার সহর, সব হবে মাটি,
আছে কসাইটোলা, নাপতে বাজার মেটেবুরুজের মাঝার।

গোঁসাই কুবিরচাঁদে কয়, কথা মিথ্যা কিন্তু নয়,
ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড আছে, জান্তে পার্‌লে হয়,
জাদু বিন্দু বোকা, লাগ্‌লো ধোকা, উলুবনে দেয় সাঁতার।

— কুবির দাস গোঁসাই

জংলা-ভৈরবী—পোস্তা

বিদায় হও মা ভগবতী, এ সহরে এস না কো আর,
দিনে দিনে কলিকাতার, কর্ম্ম দেখি চমৎকার।
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায় মনে ক'চ্ছেন সুবিচার,
এ দিকে ধুলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চ'ল্‌বে না, লহোরের জল তুল্‌তে মানা,
লাইসেন্স টেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানায় বাসি ময়লা রবে না।
হেল্‌থ অফিসর সেতখানার মেজেষ্টর,
ইন্‌কমের এসেসর সাল্লে সবারে,
আবার গবর্ণরের গুয়ে দৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হ'তেছে মা গো, অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই তো জ্বালা মা গো, ম'লেও শান্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা, কলেতে ক'র্ব্বে সৎকার।
ছতোম দাস তাই সহর ছেড়ে, আশমানে করেন বিহার।

— কালীপ্রসন্ন সিংহ

কলিকাতার কলের জল

কালাংড়া—আড়খেমটা

বিপদ ক'ল্লে কলের জলে, এ জলে অনেকে জ্বলে,
গালে হাত ভাব্‌ছে ব'সে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারদের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ, দানা পায় না আস্তাবলে।
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাইক কারও ঘরে,
একটী দিন না মাথা ধরে, সবাই আছে কুতূহলে।

রামনাম সত্যবাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী,
খোট্টাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গলিজ মহলে।
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল,
নিমতলা বন্দ ছিল, তিন দিনে একটা না জ্বলে।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জ্বলে।
জানাচ্চে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে হাত তুলে কেবল কপালে।
হেল্‌থ অফিসার এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে, দেখে কবিরত্ন বলে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

কলিকাতার জলপড়া

বাউলের সুর—খেমটা

কল্‌কাতার জলপড়া কি চমৎকার।
চল ভাই সবে মিলে, ভাঁড় নিয়ে যাই একটীবার (কি মজার)।
ভাঁড়ের মুখে খুরি খানি, তায় কালজিরে আছে,
ভাঁড় জল ভরা আছে (মরি হায়)
এ ভাঁড়ের জলে, সবাই মিলে,
খেয়ে নাওরে একটীবার, ব্যাধি আরাম হবে সবার (কি মজার)।
থাকে থাকে যাচ্চে সবে দেশ বিদেশের লোকে,
পথে কতই বাবু লোক, আবার বাবুর ঘাটে,
গড়ের মাঠে কেমন ব'সে আছে সার সার (কি মজার)।
শেষে আবার মজার কথা, কিবা শুনতে পাই,
এসেছে এক সন্ন্যাসী গোঁসাই (মরি হায়)।
আবার এসে তিনি, বল্লেন শুনি,
আমি হ'তে পারি দু-পা তুলে গঙ্গাপার।

— আনন্দচন্দ্র দাস

কলিকাতার প্লেগ

ঐ দেখ মা হাতটি তুলে দিতেছেন অভয়।
রাঙা চরণে শরণ নিলে রয় কি মারীভয়।
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়, মায়ের চরণ-কৃপায়,
মায়ের কোলে মায়ের ছেলে ল'য়েছে আশ্রয়।
ছাড় ক্রন্দনেরি রোল, ঘুচবে সকল গণ্ডগোল,
জয় কালী জয় কালী বল, মায়ের কোলে ছেলের জয়।

— অজ্ঞাত

কলির সহর কল্‌কেতা

বাউলের সুর—খেম্‌টা

আজব সহর কোল্‌কেতা।
রাড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী মিছেকথার কি কেতা।
হেথা ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে, বলিহারি ঐক্যতা,
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোণার বেণের কড়ি,
খেম্‌টা খেম্‌টির খাসাবাড়ী, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁথা।
গিল্‌টী কাষে পালিস করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

— কালীপ্রসন্ন সিংহ

ঘোরকলি

বাউলের সুর—খেম্‌টা

হদ্দমজা কলিকালে ক'ল্লে কল্‌কেতায়।
মাগীতে চড়্‌লো গাড়ী ফেটীং জুড়ি,
হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায়।

ষষ্ঠি মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না,
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে, ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোসল-খানায় খানসামাতে টাউয়েল দিয়ে গা মোছায়।
পায়ে লেডিবুট, ভক্ষণ পাঁউরুটী বিস্‌কুট,
আবার আল্‌কানিরুট না দিলে, তেলের মশলা নাহি হয়।
বাঙ্গালার চাল আর নাহি পেটে, ইংরাজিতে এঁটে সেঁটে,
বাড়ী মেল কর্ত্তাদের বেড়া এঁটে, একি হ'লো দায়।
আবার পুরুষের হাত ধ'রে, পাবলিক লেক্‌চারে যায়।

— কাঁড়াদাস

বিভিন্ন স্থাপত্য ও আবিষ্কার বিষয়ক সঙ্গীত

গঙ্গার পোল

বাউলের সুর—খেম্‌টা

গঙ্গাতে পোল হ'ল অতি চমৎকার।
এমন দেখি নাই কখন আর।
গঙ্গার জোয়ার ভাটাতে, থাকে সমান তাতে,
কমি বেশী হবে না'ক, পোল নাবে আর উঠে—
ছাগল ভেড়া, গাড়ী ঘোড়া, ইঁদুর কুকুর হয় পার।
শুক্র মঙ্গলবারে, পোল খুলিলে পরে,
মানোয়ারি জাহাজ সকল যাতায়াত করে,
দু'দিক ঘেরা লোহার বেড়া, তাতে গ্যাসের আলো কি বাহার।
পোলের মধ্যস্থান দিয়ে, যাচ্চে গাড়ি চলিয়ে,
মানুষ মরার ভয় নাইকো (গাড়ী চাপা পড়িয়ে);
একদিক্ যাবার, একদিক্ আস্‌বার, বড় সুখ হ'য়েছে চলিবার।
যত কুঠিওয়ালাগণ, করে নির্ভয়ে গমন,
মেঘ ঝড় তুফানের ভয় সব হ'ল নিবারণ—
সকল সময় আসা চলে, দিবা রাত্রি নাই বিচার।

— তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন

গ্যাসের আলো

ভৈরবী — একতালা

আভা যার নিরখিয়ে নিশাপতি লাজ পায়,
এ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়।
নিশাগমে পথচয়, এবে গো আলোকময়,
চাঁদের চাঁদনী ছটা, এবে আর কেবা চায়।

— শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

রামপ্রসাদী সুর—একতালা

কি বাহার গ্যাসের আলো।
বিজ্ঞান-প্রভাবে বটে, ভাল কীর্ত্তি প্রকাশ হ'ল।
রাজধানী কল্‌কাতা সহর এতদিনে জাঁকাইল।
পথে ঘাটে আস্‌তে যেতে দিবা রেতে ভাবনা গেল।
মরি কি কল কারখানা, তেল প'ল্‌তে কিছু লাগে না,
ধোঁয়াতে জু'ল্‌ছে আলো, বাতির চেয়ে দেখ্‌তে ভালো।
সুচিকণ আলোক ছটায়, পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায়,
দিন রাতির নাই ভেদাভেদ, দেখে শুনে প্রাণ জুড়াল।

— রাধানাথ মিত্র

টেলিগ্রাফ

বিভাস—আড়া

বলিহারি কি আশ্চর্য্য মানবের বুদ্ধি কৌশল।
দেবশক্তি হস্তগত! আর কি অদ্ভুত বল?
চঞ্চলা চপলা-বালা, দেবলোকে করে খেলা,
বাঁধি তারে, তারে তারে, নির্ম্মিল বিচিত্র কল
বার্ত্তাবহে বার্ত্তা বহে, এ দূত সে দূত নহে,
নিমিষে বৎসর চলে, যুগে লাগে অনুপল;
যোজন অন্তরে থাকি, মুহূর্ত্তে সংবাদ রাখি,
ভুবনে কোথা কি ঘটে, অপূর্ব্ব বিজ্ঞান-বল।

— রাধানাথ মিত্র

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ.

ভৈরবী—একতালা

বেগশালী বাষ্পরথ, ঘণ্টায় দিনের পথ,
ছুটে যায়, ভারতে তুমি গো ছটালে তায়।
মনের সমান যায়, যথায় তথায় যায়,
এ হেন তাড়িত-যন্ত্র, ভারতে তব কৃপায়।
আরো আমাদের তরে, নিয়ত যতন ক'রে,
কতই সাধিছ হিত, এক মুখে কব কায়?
প্রতি লোমকূপ যদি, কথা কয় নিরবধি,
তথাপি করিতে শেষ, নারিবে নারিবে তায়।

— শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

রেলওয়ে—পরমার্থ বিষয়ক

রামপ্রসাদী সুর — একতালা

এই দেহ রেল-রোডের কল।
ভবপথে করছে চলাচল।
কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এঞ্জি কৌশল,
উদর বয়লারেতে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, প'ড়ছে তাতে অবিরল।
ভাঙ্গা ফুটো সারা অয়েল করা, ডাক্তারের কাজ কেবল।
সম্মুখেতে লণ্ঠন তার, চক্ষু দুটি সমুজ্জ্বল।
ঐ যে শ্বাস পবনে, হ'চ্চে কলের ঘুৎঘুতানি অবিরল।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল।
ধর্ম্ম জ্ঞান গার্ড, কাম, ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহীদল।
লকোমটিব ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল।
আফিস বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল।
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস দুই, ড্রাইভার তার মন প্রবল,
যাহার সদ্‌গুণ, দীন জানে দ্বন্দ্বক নিশান কেবল।

— দীন বাউল

বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন সম্প্রদায় বিষয়ক গান

ওকালতি

মূলতান—আড়খেম্‌টা

সুখ নাই উকিল মহলে
ওকালতির প্যাঁচ লেগেছে, উকিলের গোলে।
কোর্টে নাই মিছিল মামলা, ভাবছে ব'সে সকল আমলা,
উকিলেরা বেচ্চে সামলা, কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো যুত, জুটেছে অনেক ভুত,
হ'য়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদছে সকলে।
হরিঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরি তেমন,
কেউ ঢুক্‌ছে কেউ বেরুচ্ছে নজীর বগলে।
পূর্ব্বে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়,
কৃষ্ণকিশোর রামপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হাইকোর্ট মামলাময়, উকিল সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্ছে হলে।
যাঁদের পসার হ'য়ে গেছে, আয় তাঁদের সমান আছে,
তাঁদের নাই হাজা শুকা বার মাস চলে।
*** বাড়া করে যেমন কড়া,
কাড়ি তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে।
যাদের না অন্ন জোটে শাইনিং নাইকো মোটে,
জুটেচে সব জেলা কোর্টে ** বেটের দলে।
কি দুর্দ্দশা কব কার, কেউ বা হ'চ্চে ব্যবসাদার,
বাসা খরচ চলা ভার, কবিরত্ন ঠিক বলে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

কর্ত্তাভজার গীত

সতীমার ভজন

আরে তোর দিল্‌কা ভিতর, আরে তোর দিল্‌কা ভিতর,
সোণার কেতাব, নয়ন বাগান খানা, আরে তোর দিল্‌কা ভিতর,
যে মজেছে সেই পেয়েছে আর মজে নয়নে, (ক্ষেপা মন শোন রে)
ও তোর ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন, ছা গেছে তার উড়ে,
(রে ভাই ছা গেছে তার উড়ে)

আসমান জোড়া ফকীর রে ভাই জমিন জোড়া কাঁথা,
আবার সেই ফকিরের ফৌজ ম'লে কবর হবে কোথা।
(রে তোর দিল্‌কা ভিতর।)

— আনন্দচন্দ্র দাস

সতীমার ভজন

ওমা সতী, কুমতি ঘুচাও আমার এইবারে।
আমি হ'য়েছি পরাধীন, কিসে যাবে দিন, ঘুচাও কুদিন,
এখন দিনের দিন তোমা বই কে নিস্তারে।
তুমি পিতার মা, পুত্রের মা, জগতে বলে মা, তুমি আমার মা,
এখন মা ব'লে ডাকে জগৎ সংসারে।

— আনন্দচন্দ্র দাস

কর্ত্তাভজাদিগের গীত

বাউলের সুর—খেমটা

স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোনরে ক্ষেপা, বেড়াস একা, চিন্তে নার্‌বি ধর্‌বি কি।
কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়,
কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্ম্ম কথা বল্‌বো কি।
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,
জেয়ন্তে ধরিতে গেলে হাবু ডুবু খায়,
সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে গিয়া আঁখি।

— অজ্ঞাত

কারিগরের গান

(সম্ভবতঃ ময়রা)

মুড়কি সামাল সামাল চিঁড়ে ভিজে গেল।
এতরাত্রে দই কোথা পাওয়া যায় বলো।
ওরে জিলাপি গজা, খেতে বড় মজা,
একে রসগোল্লা তাতে খিরে খাজা ফেল।

— অজ্ঞাত

কেলুয়ার (মেথর) গীত

ভৈরবী-খেম্‌টা

বাবু নগ্‌দি রোজ্‌গার, সব সে ওলজার,
নকরি ঝকমারি, বাবু পরেস্তাজারি।
কাম হামারি, পরেস্তাজারি (বাবু)।
কাহে বোলাও কেলুয়া ঝাড়ু বরদার।
হরদম হাজির, কাহে বোলাতি,
কাঁহে রয়তে কেলুয়া ঝাড়ু বরদার।

— গোপাল উড়ে

ঢুলীদের গীত (পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে)

কবির সুর — আড়খেম্‌টা

আজ গোলোকনাথ গোলোক ত্যজে উদয় নন্দালয়।
যত সব গোপের নারী, চ'লেছেন সারি সারি,
আহ্লাদে মত্ত হ'য়ে, যশোমতীর ভাগ্যোদয়।

— অজ্ঞাত

কবির সুর—খেম্‌টা

পূর্ব্ব পুণ্যফলে পেয়েছ রাণী নীলমণি ধন কোলে।
ক'রেছ কতই পুণ্য, তাই গোলোকনাথ অবতীর্ণ,
আবার ভৃগুমুনির পদচিহ্ন, ছিল ভিন্ন বক্ষঃস্থলে।

— অজ্ঞাত

তোতলার খেদ

মিশ্র-ঝিঁঝিট — খেম্‌টা

আমি সাড়ে কি কাঁড়ি গো, হাউ হাউ হাউ ক'রে,
কট্‌টা মহাশয়, শুন দুখের পরিচয়।
ভুলে ভ্রান্টে এক ডিনের তরে, পাইনে আমি যেটে ঘরে,
বৌটি কটো দুঃখু করে, শোবারি সময়।
বে কোল্লাম যা এঁচে এঁচে, সে আঁচা গিয়েছে কেঁচে,
ওটো বেটা ঠাক্‌টে বেঁচে, বংশ বিড়্‌ডি নয়।

— নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধোপার খেদ

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেম্‌টা

ধোপানীকে একলা রেখে যেতে পারিনে,
রাজার বাড়ী ডাক প'ড়েছে থাক্‌বো কেমনে।
সে যে আমার প্রাণের পাখী,
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি,
যখন ভাই ঘুমায়ে থাকি, দেখি স্বপনে
ধোপানী পূর্ণিমের শশী,
প্রাণের অধিক ভালবাসি,
বিধুমুখে মধুর হাসি সদা হয় মনে।

— রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ন্যাড়া-নেড়ীর গান

মন মজ রে হরি পদে।
মিছা মায়া, কেবল ছায়া, ভুল না মন আমোদ-মদে।
দারা সুত পরিজনে, ও মন ভেবে দেখ মনে মনে,
কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরি চরণ-তরি বিপদে।

— রায় দীনবন্ধু মিত্র

ফকিরের গান

আশমানে উঠেছে চন্দ্র, আশমান শোভে ভাল।
মা বাপের কোলে বেটা ঘর ক'রেছে আলো।
সেই যে ভাজন, বেটা পেয়েছে যে জনা।
নিরবধি মার অঞ্চলে বাঁধা কাঁচা সোণা।
মা রোজ আনে রোজ ভাঙ্গায় রোজ বসিয়ে খায়।
বেটা হ'তে ধনের নেওয়া ঘরে ব'সে পায়।
যে নেওয়ার যে বস্তা ঘরে ব'সে মেলে।
ম'লে দেবে থান কাপড় ছেল্‌কা নেবে গলে।
থান কাপড় ক'রবে দাপন সেই যে বেটার কাম।
মৃত্যুকালে কর্ণে শুনায় কেবল হরিনাম।

— নারায়ণ ফকির

ফোতো কেরাণী

বাহার—ঠুংরী

কতক অফিসার, পামর ঘোর পাতকী নারকী নচ্ছার।
আধুনিক অন্ত্যজের ছেলে, চ'টে যান পরিচয় নিলে,
কেউ মালী কেউ জেলে, বইত জলের ভার।
(সহরে) কাল বুট ষ্টকীং পায়, আলপাকার চাপকান গায়,
কড়া মেজাজ হঠাৎ বাবু হঠাৎ অবতার।
জ্যাকেট প্যাণ্টুলেন আঁটা, কোঁকড়া চুলে বাঁকড়া কাটা,
এলেন যেন বিলাত থেকে চিনে উঠা ভার।
গলে চেন, রুমাল হাতে, শীল আংটি সব আঙ্গুলেতে,
পা পড়ে না পৃথিবীতে, এমনি অহঙ্কার।
বজ্জাতি সব হাড়ে হাড়ে, মনে মনে কাতলা পাড়ে,
জেল হ'য়েছে মামার বাড়ী, মাসে যান দুবার।
সেকেলে মানুষ পেলে, ডাকেন পাস নেওসে ব'লে,
পয়সা সব পকেটে ফেলে, অমনি কামরা পার।
আহার শুনে হেসে মরি, রোচে না বেঙ্গলী কারী,
অক্সটং ফাউলকারী, দু-সন্ধ্যে আহার।
বাপ দেশেতে ক্ষেতে খাটে, মা বোনেতে চরকা-কাটে,
রাঁড়কে শোয়ান ছাপর খাটে, পরান গুল বাহার।
বদমায়েস নেশাখোর, দিবানিশি নেশায় ভোর,
জুতা ছাতি ব্যাগ চোর, চোরের সর্দ্দার।

প'ড়ে দুপাত এ বির বই, বলেন না অলরাইট বই,
হাত কাঁপে নাম ক'র্ত্তে সই, বিদ্যা চমৎকার।
পা ফেলে ইংলিশ ঢঙে, কথা কন ইংলিশ টঙে,
ধরা প'ড়ে যান রঙ্গে, আবলুসের আকার।
দ্বিজ কবিরত্ন বলে, এ দেশে না জন্ম হলে,
চল্‌তো নাকো এ বাবুদের, ডান হাতের ব্যাপার।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

বেদিনীর গান

বেহাগ পরজ—খেম্‌টা

ভাঙ্গা মন যোড়া দিতে কার আছে, আয় লো ছুটে।
বারমাসের আড়াআড়ি এক নিমিষে যাবে প'টে।
এম্নি মোর গাছ-গাছড়া, তেলপড়া আর জাড়ি-জাড়া,
সতীন হ'য়ে ভাতার ছাড়া, মরে বেটী মাথা কুটে।
এ ওষুদ ছুঁতে ছুঁতে, হুড়্‌কো বৌ যায় আপনি শুতে,
বারফট্‌কা পুরুষ যারা, আঁচলধরা হ'য়ে উঠে।

— গোপাল উড়ে

ভিস্তির গান

খাম্বাজ—খেম্‌টা

বড়া মজেদার দরিয়ামে মিঠা পানি লিয়া।
হায় আসল খাঁটী, উজান ভাঁটী, মিটা গাঙ্গের পানি,
যো খায়া পস্তায়া যো না খায়া পস্তানি গিয়া,
হায়! রসিয়া হয়'ত রস মিলাওয়ে, যোগ মিলাওয়ে যোগী,
যেসি পিয়া উসি রহা, বুড়্‌ঢাকে যোয়ানী কিয়া।

— গোপাল উড়ে

খাম্বাজ—খেম্‌টা

আরে কি বাণ মারিলি প্রাণ চাইয়া রে।
যেন মক্কা থেকে দেখ্‌চে ফকির দাঁত-কপাটী মে।
আমার বাড়ী যাইও বঁধু বস্‌তে দিমু পীড়া,
জলপান করিতে দিমু সরু ধানের চিড়া রে।
তুমি ত ছন্দর ন্যায়া ফাঁকি দিয়া যাও ভাই রে,
আর তোমার লেগে আমি কেবল মার খাইয়া মলাম রে।
তুমি ত ছন্দর মুখ তোর তরে এত দুখ সই রে।
এবার বিচ্ছেদ-জ্বরে, প্রেম-বিকারে, বাঁচি কি না বাঁচি রে।

— গোপাল উড়ে

মিউনিসিপাল কমিশনারগণ

বাউলের সুর—খেম্‌টা

ও চাঁদ ফাঁকি দিয়ে ভোট নেবে ভেবেছ আবার?
চিনেছে তোমায় সব রেট্‌পেয়ার—
যেমন ক'রেছি বোকামী, দেছ আক্কেল সেলামী,
বেলতলাতে ন্যাড়া যায় হে কবার?
দেশের ভাল হবে ব'লে, মিলিয়া সকলে,
আদর ক'রে ক'ল্লেম কমিশনার;
তার রাখলে খুব ধর্ম্ম, ক'ল্লে উচিত কর্ম্ম,
এখন ফিকির আঁট্‌ছ গলায় ছুরি দিবার।
রইলে মনের মত হ'য়ে, থাক্‌তেম সব স'য়ে,
রাখ্‌তে পাল্লে কই তেমন পসার?
কিসের অহঙ্কারে মত্ত? কদিন এ ইন্দ্রত্ব?
তিন্ন বছর বই ত আর রবে না পাউয়ার।
তোমার নয় হে পিতৃশ্রাদ্ধ, যে করবে না বরাদ্দ,
কথা কবার কারো নাই অধিকার;
যখন সাধারণের টাকা, সকলকে চাই ডাকা,
একলা হরির খুড়ো কে তুমি তার?
তখন কাচা দিয়ে গলে, "আমায় ভোট দাও" ব'লে,
দ্বারস্থ হ'য়েছ দ্বারে দ্বারে,
এখন বীচি গেলে উলে, সকল গেছ ভুলে,
দেখলে যেন চিনতে পার না আর।

ক'রে গরীবকে পেষণ, শুদ্ধকে শোষণ,
সেই রক্ত উঠা ধনের এই কি ব্যভার?
ওহে তিলকাঞ্চন হ'লে, অনায়াসে যা চলে,
কর বৃষোৎসর্গ, পেয়ে পরের ভাঁড়ার।

— অজ্ঞাত

মেথরাণীর গীত

টোড়ি-ভৈরবী—আড়্‌খেম্‌টা

কেলুয়া তোর পিরীতে রে একি হ'ল আমারে,
তিলেক না দেখ্‌তে পেলে প্রাণ কেমন করে।
নাম ধ'রে ডাক্‌লে পরে, থাক্‌তে পারিনে ঘরে,
দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, যৌবনের ভরে।

— গোপাল উড়ে

রামবল্লভীদিগের গীত

বাউলের সুর — খেম্‌টা

কালী কৃষ্ণ গড় খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাধার বিবাদ দ্বিধা তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কৃষ্ণ গড় খোদা বল রে।

— অজ্ঞাত

সাপুড়ের গীত

ঠুংরী

সাপে বাঁদরে খেলা করে, ওগো নয়া নয়া সাপ।
ঢোড়া বোড়া যোড়া যোড়া, বিশ হাত লম্বা চক্রছাড়া
ফোঁস ফোঁস গোখ্‌রো, ফোঁস ফোঁস কেউটে,
দু মুখো সাপ, তে মুখো সাপ, ছ মুখো সাপ তিনটে,
খোয়ে গোখ্‌রো দোয়ে গোখ্‌রো ফলারে গোখ্‌রো,
রঙচেংরা ওগো দেখে যাগো দেখে যা।
আমার সাপের পা পাঁচ পা, রং বেরঙের হিলি মিলি গা।
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে।

— রাজকৃষ্ণ রায়

হিজ্‌ড়ের গান

হিজ্‌ড়ের সুর

ও বেঁচে থাক ছেলের বাপ। (ওগো দিদি)
আমি আশীর্ব্বাদ করি, ছেলের ঘরে ছেলে হবে পুরাবে মোর
মনোসাধ, আমি বছর বছর প'র্‌ব এসে ঢাকাই কিংখাপ।
আজ বুঝি হ'য়েছে ছেলে, পাড়ার লোক এসেছে ব'লে,
ধাই এসেছে আগড় তুলে, পাইগো দুশাল।
ছেলের বাপ দিলে আশা, গড়িয়ে দেবে কাণের পাশা,
সেই আশা নৈরাশা ক'রো না আর।

— অজ্ঞাত

বিবাহ সংক্রান্ত সঙ্গীত

কন্যাদায়

বাহার-খাম্বাজ— কাওয়ালী

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়,
এ পাশ ধরায় কে আন্‌লে বল।
বিশেষ যাদের কন্যাদায়, তাদের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় পাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল।
মাই না ছেড়ে মাইনর দিয়ে, মুক্তার সাতনর বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষে, কন্যাকর্ত্তার আসে জল।
এলের ছেলে নিতে হ'লে, পলাতে হয় ভিটে ফেলে,
এমের অর্দ্ধ নাভিজলে, দিতে হয় জীবনের জল।

— কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি

বহুবিবাহ

খাম্বাজ—একতালা

কেন হেন হীনমতি,
এ পাপেরি স্রোতে কে রক্ষিবে বল,
হে দুর্ব্বল বঙ্গজাতি।
নিজ দোষে দেশ দিলে ছারে খার,
নিজে আবার কেঁদে কর হাহাকার,

নিজের হাতে আছে নিজের প্রতিকার,
সে দিকে দেখিতে নাহিক শকতি।
মনে ভেবে দেখ নিজের ব্যবহারে,
মজালে কত শত পরিবারে,
কত অবলারে ভাসালে পাথারে,
কাঁদালে কত শত যুবতী।
এক ভার্য্যা ভার বহিতে না পার,
তবে কেন বহু দার গ্রহণ কর,
নিজের গলগ্রহ পরেরি নিগ্রহ,
করিতে তোমারে কে দিল যুকতি।
বহু বিবাহের বিষময় ফলে,
সোণার বঙ্গভূমি যায় দেখ জ্ব'লে,
হেন বিধি কভু বল্লালে কি বলে,
বল দেখি শুনি কুলীন-সন্ততি।

— অজ্ঞাত

বাল্য বিবাহ

বাহার—যৎ

ডুবিল সোণার দেশ পাপের সাগরে,
পরিপূর্ণ দশদিক্ ঘোর হাহাকারে।
মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে স্বর্ণ ভারতেরে।
আরো হবে দেহ হীন, অল্পায়ু দিনে দিনে ক্ষীণ,
রাখ গো সমাজবাসী, শিশুবালিকারে।

— নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ললিত -খাম্বাজ— একতালা

বঙ্গে একি দেখি অত্যাচারে।
গুণজ্ঞানযুত বঙ্গেরি সন্তান, জ্ঞান অভিমানে করে অভিমান,
কিন্তু একি জ্ঞান, নাই সন্ধান, অজ্ঞানের মত যত ব্যবহার।
দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকারি সনে,আবদ্ধ করিছে বিবাহ বন্ধনে,
বারেক ভাবিয়ে নাহি দেখে মনে, কি বিষম ফল ফলিবে তাহার।
স্বার্থপর হ'য়ে জনক-জননী, সন্তানের শুভাশুভ নাহি গণি,
বাল্য-পরিণয়ে করিছে বন্ধন— একি দেশাচার।

অন্ধ কি তাহারা নিজ মন্দ জ্ঞানে, বারেক হেরিয়ে না দেখে নয়নে,
কেবল মাত্র এই পিশাচ বন্ধনে, দুখার্ণবে ভাসে কত পরিবার।
কতদিনে বিধি অনুকূল হবে, এ দারুণ প্রথা বঙ্গ ছাড়ি যাবে।
মনুধর্ম্মমতে মানবে চলিবে, ঘুচিবে এ দেশের রোদন হাহাকার।

— কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি

বিবাহের পণ

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব-বিদ্যালয়;
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ-লোকেরা মারা যায়।
না হ'তে এন্ট্রান্স পাস, চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি,এ., সোণার ঘড়া গাড়ু, এমেতে সর্ব্বস্ব চায়।
কন্যার বাপ বরকর্ত্তারে, কহিছে মিনতি ক'রে,
তোমার এ গাঁট-কসার চাপন ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়।

— অমৃতলাল বসু

বুড়োবয়সে বিবাহ

ভৈরবী—একতালা

বুড়ো বয়সে সুখ-অভিলাষে বিবাহ গ্রহ যে করে,
বুদ্ধি মোটা, মোনাকাটা, তার সমান নাই এ সংসারে।
বিয়ে হ'লে বৃদ্ধকালে, কায দেখে না কাযের কালে,
যুবতীর যৌবনকালে, পতি কালগ্রাসে যান;
খেয়ে কলা,গেল শালা, ভোগে জ্বালা, শেষে পরিবারে।
দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, শাস্ত্রে বলে গলগ্রহ,
সুখভোগী হয় না কেহ,উভয়ে পরস্পরে।
হাতীর গলায় ঘন্টা দিলে, কাযেই কামিনী ঘৃণা করে,
পেয়ে জ্বালা, কুলবালা, শেষে গৌতমীর ধারা ধরে।
শেষাবস্থায় পাণিগ্রহণ,প্রান্তরেতে বৃক্ষরোপণ,
পরে সে ফল ভোগ করে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

বৈধব্য সংক্রান্ত সঙ্গীত

বাল্য-বিধবা

মল্লার—কাওয়ালী

হায়! বাল্য-বিধবা দুঃখিনী, হ'য়ে চিরপরাধীনী,
কাঁদে শোকে দিবসযামিনী;
মলিন মুখ-কমল, ঝরিছে নয়নে জল,
রোদনমাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিণী।
প'ড়ে সদা ধরাসনে, যেন মেঘ ঢাকা সৌদামিনী।
যাতনায় জীর্ণ শীর্ণ, কালিমা হয়েছে বর্ণ,
বিষাদে সদা বিষণ্ণ, যেন মাতঙ্গদলিত নলিনী।
একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রুজলে,
কেহ নাই ভূমণ্ডলে, শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী।
ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যাবে,
অবলার শোক-বিলাপে পূর্ণ হ'ল গগন-মেদিনী।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

বিধবার খেদোক্তি

আলাইয়া—যৎ

নিদয় বিধাতা! কেন রে আমারে,
পাঠালে ভারতে রমণী ক'রে রে।
কি দোষে বল রে কি ভাবি অন্তরে,
ভাসালে আমারে দুঃখ পারাবারে।
ভারত-পুরুষ, আত্ম সুখ বশ,
অবলা-দুঃখেতে কাতর নহে রে।
বৈধব্য-যন্ত্রণা, তারা ত জানে না,
পত্নীর বিয়োগে অন্যেতে মজে রে।
হে বিদ্যাসাগর, কেশব কি কর,
হ'য়ে অগ্রসর, এ দুঃখ নাশ রে।

— অজ্ঞাত

বিধবা-বিবাহ

খাম্বাজ—আড়খেমটা

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে ক'রেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের, লেগে যাবে ধুম।
মনের সুখে থাকবো মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হ'বে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই, —
আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই; —
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে।

— অজ্ঞাত

সামাজিক ব্যাধি বিষয়ক সঙ্গীত

কপট ব্যক্তিদিগের প্রতি

রাগিণী প্রবীণে—হরিনামের মালা?

আবার যাব বৃন্দাবন।
গৌর ভজন ক'রব সার, ভবে গৌরমাত্র যার,
কালী দুর্গা ভজন পূজন ক'রব নাকো আর। —
প্রভু গোপীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, ভজবো দোঁহার শ্রীচরণ।
দিনে নামাবলী গায়, রেতে হ্যট বিনামা পায়,
মাঝে মাঝে হাজির হবো ব্রাহ্মণের সভায়;-
তথায় চক্ষু বুজে, প্রেমে ম'জে, ভ'জবো ব্রহ্ম সনাতন।
প্রেমে হব সন্ন্যাসী, আমি তাই ভালবাসি,
একাহারী তিলক-ধারী, নিরামিষ-আশী—
রেতে ব্রাণ্ডি সেরি, ফাউলকারী, টেবিলে ক'র্‌বো ভোজন
হরিনামের ছাপা গায়, হরি নাম লিখিব তায়,
হরিমাটির তিলক কেটে, ভজন ক'রবো সার,
পথে, বাজারে, হরি মন্দিরে, করবো হরিসংকীর্ত্তন।
গিয়ে চার্চ্চভবনে, একতান মনে, ঢুলে ঢুলে করিব ধ্যান
মেরী নন্দনে।
খেয়ে আফিং চরস, গাঁজা সুরা, প্রেমরসে হব মগন।

— অজ্ঞাত

কপটাচার

ভৈরবী — খেমটা

হে হরি গোলোক-বিহারী, তিলক-সেবায় ক'রবে কি।
ফাউল মুরগি মটন চপ্, খাও বাবা গপাগপ,
তোর ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রবে কি।
বাপের কুটুম শালা এসে, সে রইল ব'সে,
মণ্ডা খায় শালা সম্বন্ধী।

— অজ্ঞাত

কোন অসতীর স্বামী-সম্পত্তিলাভ উপলক্ষে

কেদারা—একতালা

দেশের সর্ব্বনাশ এবারে।
দেশের যত সাধ্বী সতী, সব হবে অসতী,
অসতী নারীর যদি হয় গতি,
পাপপথে কে না ক'রবে গতিমতি, হাইকোর্টের নজীরে।
বিধি ছিল ধনী লোকের লোকান্তরে,
ধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম লোপ হ'লে পরে,
সে ধন পেতো জ্ঞাতি বন্ধু বংশধরে, পাবে না এর পরে।
কুলটা হ'লে এখন কোন মাগী,
আগে যদি থাকে বিষয়ের ভাগী,
আর সে হবে না বৈভব-ত্যাগী, বাবাজীদের বিচারে।
এ বিধি না হ'লে, জ্ঞাতি করে কোপ,
সতীকে অসতী দেবে দোষারোপ,
সতীদের স্বত্ব হয়ে যাবে লোপ, হাকিমেরা চক্র করে।
ভারত-প্রচলিত পঞ্চাননের মত,
মাইনরিটিমতে যে মত ভাল মত,
মেজরিটি মতে সে মত অমত, কোলব্রুকের মত ধরে।
কলেজ অধ্যাপক অনেক সুবিদ্বান,
জজেদের সম্মুখে হ'য়ে বিদ্যমান,
প্রচুর পরিমাণ দেওয়াতে প্রমাণ, অপ্রমাণ জ্ঞান করে।
সতী ব'লে বিষয় পায় যে গুণবতী,
পরে সে রমণী হইলে অসতী,
দুষ্কৃতি কারণে ভোগেন দুর্গতি, দায়ভাগ প্রহারে।

সে দায়ভাগ মত সমূলে সংহার,
ফুলবেঞ্চে সাত শ্বেত-অবতার,
বিচারপতিগণে ক'রেছেন বিচার, শুনে প্রাণ শিহরে।
মহামান্য জজ কেম্প গ্লোবর,
মহামতি বিচারপতি মিত্রজার,
তিন জজের রায় আছে এক প্রকার, পিণ্ডদাতা ধন হরে।
বাঙ্গালিকুলের শিরোমুকুট ইনি,
মহামান্য জজ দ্বারি গুণমণি,
প্রতিকূলে কলম ধ'রেছেন তিনি, আছে সেই সাহস অন্তরে।
দেশহিতৈষী বহুদর্শী বিজ্ঞবর,
কি ঘটনা এতে ঘটবে এর পর,
মনে মনে সে ভাব ভেবেছেন বিস্তর, ক্ষতি নাই কি করে।
বিলাতী বিচারে হ'ল সর্ব্বনাশ,
সতীত্ব ধর্ম্মের ভাঙ্গিল আবাস,
গৌরব-রবি রবে অপ্রকাশ, ভারত-ভিতরে।
আর্য্যকুলের এতে অপার অবনতি,
কলঙ্কের নদী ক্রমে বলবতী,
বারাঙ্গনা-বৃক্ষ হবে ফলবতী, এ বিধি প্রচারে।
ভদ্রাসনে ব'সে ক'র্ব্বে উপপতি,
বিধবার হবে সন্তান উৎপত্তি,
জ্ঞাতিদের মুখে ধোরে মার্‌বে লাথি, অন্য দেশে যা করে।
বৃদ্ধ হ'লে পতি অশেষ দুর্গতি,
অল্প অপরাধে কত কুলবতী,
বিষ খাওয়াইয়ে মার্ব্বে নিজ পতি, মনে যদি না ধরে।
বহুদিন বাহিরে বেরিয়ে গেছে যারা,
বিষয় পাবে ব'লে কেঁচে ব'সবে তারা,
জ্ঞাতি-বন্ধুগণে ভেবে হ'লো সারা, ঘরে যদি আসে ফিরে।
বিলাত-আপীলের র'য়েছে সুযোগ,
এই শুভযোগে, সবাই দাও যোগ,
এ যোগে যোগ না দিলে গোলযোগ, মৃত্যুযোগ এবারে।
ঘরে ব'সে যদি হ'লো, কবিরত্ন কয় বেঁচে কি সুখ বল,
ক'সে চাঁদা ফেল, বিলাতে যাই চল, নৈলে কি আর ফেরে।

— প্যারীমোহন কবিরত্ন

কৌলিন্য প্রথা

বাউলের সুর — খেমটা

বল্লালী তুই যারে বাঙ্‌লা ছেড়ে।
ডুব্‌ল ভারত কদাচারে,
সোণার বাঙ্‌লা যায় রে ছার খারে।
ভ্রূণহত্যা সাঙ্গ ক'রে, বাভিচার তুই যা রে ম'রে
পাপস্রোতে ভাসালি রে, বঙ্গ-মায়েরে অপার পাথারে।
কমলিনী সমাজে নব কুলীনের মেয়ে,
অনাথিনী বেশে থাকে মলিনা হ'য়ে,
ওদের দশা মনে হ'লে দুঃখেতে পাষাণ গলে,
কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জ্ব'লে মরে।
শ্রোত্রীয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত,
কুমারী কুলীন-কুমারী করে অশ্রুপাত।
(এবে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি,
ঘটক সনে ক'রে যুক্তি, দম্ভে কাঁপায় পদভরে।

— রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

খাম্বাজ—আড়াঠেকা

কুলীন তনয়া হ'য়ে অকূলে ভাসিয়া যাই,
অবলা ডুবিয়ে মরি, কোন কূল নাহি পাই।
হইয়ে কুলীন-বালা, সহে না সহে না জ্বালা,
মরণ হইলে বাঁচি, আর কিছু নাহি চাই।
বহু নারী হয় যার, রমণী হইলে তার,
হয় সার হাহাকার, জীবন যন্ত্রণা-ঠাঁই।

— কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী

বাবুগিরি

মূলতান—খেম্‌টা

মরি কি বাবুগিরি, দিয়ে ঠোঁটে বিরি, বেড়িয়ে বেড়ান।
আসল শিক্ষে করেন ভিক্ষে, পরের খেয়ে দিনটি কাটান।
ব্রাণ্ডি রেণ্ডি গাঁজা গুলি, ইয়ার জুটে কতকগুলি,
মুখেতে সর্ব্বদা বুলি, হুট ব'লে দেয় গাঁজায় টান।
প'ড়ে থাকে পরের বাড়ী, হ'য়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
হ'লে তাদের মনটী ভারি, হুঁকাটী কল্কেটী পানটী যোগান।

— **দাশরথি রায়**

ভাঁড়ামী

বাউলের সুর — খেম্‌টা

ভাই রে ভাই কলির মানুষ চেনা ভার, —
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার।
টেঁকে ঘড়ি, হাতে ছড়ি ফুলবাবু সেজে,
বাবু চল্লেন সমাজে — (মরি হায়)
আবার অন্দরেতে ছাঁটছে বালাম বাবুর যত পরিবার।
বেশ্যার গলায় মতির মালা মায়ের অন্ন নাই,
স্ত্রীর পোঁদে ট্যানা ভাই — (মরি হায়)
বাহিরেতে ক'চ্ছে মজা নিয়ে বাবু দশ ইয়ার।
ইংলিশ বুটে ইংলিশ কোটে বিস্কুটে রত,
বাবু ইংরাজের মত — (মরি হায়)
পেটে পা দিয়ে টিপ্‌লে পরে,
এ বি সি ডি (ভোলা মন)
এ,বি,সি,ডি পাওয়া ভার।

— **রামরতন ভট্টাচার্য**

ভণ্ডামি

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা

অবাক ক'ল্লে জুয়াচোরে;
গেল সোণার বাঙ্গলা ছার খারে।
ভাল মানুষ হতভাগ্য, বিজ্ঞ হ'য়ে অন্নে মরে।
আবার সোণার দরে রাং বিকোচ্চে,
কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।
কেহ ফলায় ভট্টাচার্য্য, ম্লেচ্ছের কার্য্য করে,
আবার মাথায় রাখে হজ্‌মি টিকি,
কেবল ফাঁকি দিবার তরে।
কেহ হ'লো রাজনীতিজ্ঞ দুই একটা বক্তৃতা ক'রে।
আবার কেহ হ'ল দেশের বন্ধু,
গালি দেয় ইংরেজেরে।
কেহ হ'লো ভক্ত সাধু, অকথ্য ভণ্ডামি ক'রে;
ওদের স্বার্থ বটে পরমার্থ, অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে,
তাতেই কেহ হ'লো কবিশ্রেষ্ঠ,
অবিকল তর্জ্জমা ক'রে।
কেহ করে বিদ্যাপ্রকাশ, দেশ ছেড়ে দেশ-দেশান্তরে;
আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি,
কত অবিদ্বানের ঘরে।
কেহ হ'লো সাহেব সুবা, রীতিমত সেলাম ক'রে,
আবার কেহ হ'লো রাজা নবাব,
বড় বড় খানার জোরে।
আসল কথা স্বার্থসিদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি ঘরে ঘরে,
যখন সময় হবে সব বেরুবে,
এ সময় ত থাক্‌বে না রে।

— **আনন্দচন্দ্র মিত্র**

মনুষ্যের কপটতা

বাউলের সুর — খেম্‌টা

সাধ করে কি পাগল হই।
যত সহজ লোকের কায়দা দেখে, জবুথুবু হ'য়ে রই।
(বাইরে) ধর্ম্ম চাপা কেটে ছাপা, মালা জপচে যত ঐ;—
(ভিতরে) গোলকধাঁধা, বাহিরে সাদা, ধর্ম্মের দফায় ঢেরা সই।
কেটে ন্যায় তন্ত্র, তর্কমন্ত্র, বিচারে কন আমি কে;
(বেড়ায়) দিয়ে ফাঁকি, পেতে চাকি, খাওয়ায় কেবল টোকো দই।
(ওরা) করে আবার কাজির বিচার, দেহ, মন আমি, নই;—
(তবে) ভোগ-লালসা সংসার-আশা তোদের এখন গেছে কই?

— কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী

লাম্পট্য

বাউলের সুর — খেম্‌টা

কলিকাতার বেশ্যাদের, লীলা অতি চমৎকার,
মায়া বোঝে সাধ্য কার।
হাঠখোলায় আছে যারা বলি তাদের ধারা,
কাপড় পোরে রাস্তার ধারে নেয় বাহার তারা।
আবার ধোপাপাড়া যেমন তেমন দরমাহাটায় চলা ভার।
যেতে নাথের বাগানে, ভয় লাগে মনে,
চাইলে পরে তাদের পানে হাত ধ'রে টানে,
কেউ বা দিনান্তরে পায় না খেতে, খোঁপা বাঁধার কি বাহার।
জোড়াবাগানে গেলে, মিষ্ট কথা বলে,
আগে ভুলায় শেষকালেতে দেয় ফাঁসি গলে,
তারা লাভে মূলে সব কেড়ে নেয়, কপ্নি পরা করে সার।
ও সেই মালা পাড়াতে, যেতে হয় প্রাণ ক'রে হাতে,
কত খেলা খেলে তারা দিন রেতেতে —
কেউ মেখে খড়ি, হয়গো ছুঁড়ি, আল্‌তা গালে দেয় আবার।
আছে মনসাতলার গলি, শুন তার কথা বলি,
হাড়কাটে মাথা গলায়ে দেয় নরবলি,
গিল্‌টির গহনা পোরে, নোলোক নেড়ে, বেড়ায় ক'রে অহঙ্কার।

আগে রামবাগান ছিল, এখন রূপোগাছি হ'লো,
তাদের কথা আজকে হেথা ব'ল্‌ব সকল,
কিছুতে কিছু না ক'র্ত্তে পেরে, যাত্রার দল করলে সার।
মেছোবাজারের ধরণ, কামরূপ কামিক্ষের মতন,
ত্রিসংসারে কোন খানে দেখি নাই এমন,
আবার সোণাগাছি থাকে যারা কশায়ের মত ব্যবহার।
দেখে শুনে লাগে ভয়, পরে বা কি হয়,
সকল নষ্ট হ'চ্চে দেখ নারীর মায়ায় —
তাইতে ব'ল্‌ছে হরি, বিনয় করি, বেড়াও হোয়ে হুঁসিয়ার।

— অজ্ঞাত

নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ক সঙ্গীত

নীলকরদিগের অত্যাচার

আড়ানা-বাহার — তেওট

হে নিরদয় নীলকরগণ!
আর সহে না প্রাণে, এ নীল দহন।
কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল-আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, ক'ল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটেছ সকল তো হে, কি আর আছে এখন।
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।

— বিদ্যাভূষণ

মল্লার—আড়া

নীলদর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে, প্রজার বল ভাই কি রেখেছে।
কারো * * কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই দিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ ম'রেছে।
ইডন, গ্র্যান্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে।

ইণ্ডিগো রিপোর্ট প'ড়ে, কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে , আবার মুখ দেখাতেছে।
ব'ল্‌তে মুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স কি বিচার ক'রে,
বেচারা লংকে ধ'রে, একটী মাস ম্যাদ দিয়েছে।
ওয়েল্‌স, পিকক, জাক্‌সনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * * হাজার টাকা ফাইন ক'রেছে।
নিদারুণ সেনটেন্স শুনে, সিংহবাবু দয়াগুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াল্টার ব্রেট তায় তাকে পেয়েছে।
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইন যে সুনিপুণ, এবার তা বেরিয়ে প'ড়েছে।
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সে অবধি দেখি মাতা, রেস্ হেট্রেড খুব চেগেছে।
বেঞ্চে বাতুলের মত, লম্ফ ঝম্ফ কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে।
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার ক'রে গেছে।
মহারাণী তোমা প্রতি, এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকতি, ধীরাজ এই বলিতেছে।

— ধীরাজ

মহিলাদের বিষয়ে রচিত বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীত

অপূর্ব্ব সতী

ঝিঁঝিট—আড়্‌খেমটা

পোড়ার মুখে নাড়ার আগুন তোর।
একেবারে ভুলেছিস্ কি মুড়ো খ্যাংরার কত জোর।
মেরে তোরে মেয়ে নাতি, ভেঙ্গে দেবো বুকের ছাতি,
জ্বালায়ে মদনের বাতি, সুখে ক'র্‌বো নিশিভোর।
সাধে কি তোর ওপর চটা, কিছু নাই তোর রূপের ছটা;
দেখে তোর ঐ দীর্ঘফোঁটা, তাতে কি মন ভোলে মোর।

— নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষত্রিয়াললনার মহিমা সূচক সঙ্গীত

আলাইয়া—কাওয়ালী

এই ধরাতলে ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয় ললনা।
যবন-প্লাবনকালে, পড়িয়া জঞ্জাল-জালে,
সহিলে কতই যন্ত্রণা।
পশিলে দুরাশয়ে, সতীত্ব যাবে এই ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিলে ভয় ভাবনা।
জ্বলিলে তার ক্রোধানল, করিতে দেশের কুশল,
দিলে ভূষণ সকল, হ'য়ে প্রসন্ন বদনা।
সতীত্বের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠালে অনলের আগে, সবে করি উত্তেজনা।
যতদিন রহিবে ক্ষিতি, ততদিন রটিবে খ্যাতি,
তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী, পতি-পরায়ণা।

— অজ্ঞাত

মুসলমানী গীত (?)

কালাংড়া — দাদ্‌রা

নিশি হ'লো ভোর, ডাক্‌চে ভোঁদড়, প্রাণনাথ কেন এলো না,
এত সাধের প'ড়ে রৈল, ঘেঁটু ফুলের বিছানা।
ফর্সা হ'লো পূর্ব্বদিক, গেলা যায় না পানের পিক,
ছাতারেতে দিচ্ছে চিড়িক, হিড়িকে প্রাণ বাঁচে না।

— অজ্ঞাত

মূলতান — আড় খেমটা

তোর পিরীতে সব খোয়ালাম, বাকি কেবল টুক্‌নী নিতে।
পাতা লতা কুড়িয়ে ম'লেম, পার্‌লেম না আগুন পোয়াতে।
তোর পিরীতের এমনি মজা, ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজা,
যেমন মজা, তেমনি সাজা, দিলি রে তুই বিধিমতে।

— অজ্ঞাত

ভৈরবী—খেম্‌টা

মান ক'রোনা কমলিনী, করি তোর পিরীতের আশা,
গুব্‌রে পোকার কমল তুমি, আমায় ক'ল্লে বাদুড়-চোষা।
চাক্‌রি করি, ছ'পোণ কড়ি, তুমি চাও প্রাণ ঢাকাই সাড়ী,
তোমার জন্যে ক'রে চুরি, জেলখানা কি ক'রবো বাসা।

— অজ্ঞাত

সামাজিক পরিবর্ত্তন

বাউলের সুর—খেম্‌টা

সময় যত ব'য়ে যায়, (ভাই) কতই শুনিতে পাই,
কাল-সাগরের ঢেউয়ে সদাই হাবুডুবু খাই।
নাই আর কুলবতীর লাজ, সদাই বিবিয়ানা সাজ,
রান্না বাড়া ছেড়ে দিয়ে, ছুঁচে দড়ি কায,
(আবার) গাউন কোসে দেশবিদেশে,
গেয়ে বেড়ায় যাচ্ছে তাই।
নাই আর সে পুরুষের বল, তা'রা গৃহিণীর অঞ্চল,
ঘরে বাহিরে রোজগারে সব রমণীমণ্ডল,
(আবার) পুরুষ ভেড়ুয়ার রকম সকম, দেখে শুনে ম'রে যাই।

— অজ্ঞাত

স্ত্রী-রহস্য

সিন্ধু-জংলা — খেম্‌টা

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দু'বেলা চড়ে না হাঁড়ী,
তাইতে আসি শ্বশুরবাড়ী করি কালযাপন।

— দীনবন্ধু মিত্র

স্ত্রী-স্বাধীনতা

ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন ক'রে খুলে দেছ ডানা।

বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছ শিকল কেটে,
এখন গেটের বাহিরে পা দিয়েছি, দখল কর জেনানা।
আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পাব,
টপ্পা গেয়ে ক'র্‌বো সুখে বাবুয়ানা।
এখন তোমরা কুটনো কোটো বাটনা বাটো,
দাও লক্ষ্মী-পূজার আল্‌পনা।
আমরা সব ছাড়্‌বো সাড়ী, রাখবো দাড়ী,
গাড়ী চ'ড়ে আনাগোনা।
(গুণ-পুরুষ) গাড়ী চ'ড়ে আনাগোনা।
ছাড়্‌বো না আড়-নয়ন, আর মোহন বেণী,—
ঐটি নারীর নিশানা,
(গুণ-পুরুষ) ঐটি নারীর নিশানা;
প্রেমের বন্দর, রইল অন্দর, গুছিয়ে কর গিন্নিপনা।

— অমৃতলাল বসু

বিবিধ

কলিকাল

বাউলের সুর — খেম্‌টা

কলিকালের ব্যবহার হ'লো অতি চমৎকার।
এ ঘোরে দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু ভবসিন্ধু কর পার।
জুয়াচুরি বাটপাড়ি ভিন্ন কথা নাইকো আর,
কেউ বা সার ক'রেছে বেশ্যার বাড়ী, ত্যজ্য ক'রে পরিবার।
পরাশরের বিধান নিয়ে, হ'তেছে বিধবার বিয়ে,
সাবেক মত ছেড়ে দিয়ে, নূতন নূতন ব্যবহার।
ভারত পুরাণ ত্যজ্য ক'রে, মজা নিচ্ছে বাইবেল প'ড়ে,
আবার চশমা নাকে, দাড়ি রেখে, লুটছে মজা অনিবার।

— অজ্ঞাত

গুরুমারা বিদ্যে

মিশ্র-ঝিঁঝিট — খেম্‌টা

বাপের জন্মে ক, খ, কেমন তা চক্ষে দেখিনে,
দোয়াত কলম কারে বলে তাওতো জানিনে।
গুরুমশাই ডাক্‌তে এলে, পগারে পাত্তাড়ি ফেলে,
দৌড়ে গিয়ে লুকাইতাম পাইখানার কোণে।
বাবা ব্যাটা মার্‌তো যেদিন, গুঁড়ো করে ফেল্‌তো সে দিন,
ধুক্‌ড়ি মন্ত্র জান্‌তাম ব'লে তাইত মরিনে।

— **নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

চাঁপদাড়ি

খাম্বাজ— একতালা

চাঁপদাড়ি রাখা, চোকে চসমা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক, নম্বরে অধিক,
দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে।
যাদের আঁতুড়ে গন্ধ গায়ে পাওয়া যায়,
চস্‌মা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,
সে সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়,
গম্ভীরভাবে ব'সে থাকে চেয়ারেতে।
ফিলজফার যেন ভাব্‌ছেন ফিলজফি,
নবাবী আমলের পুরাণ মৌলবী,
বেদব্যাস কিম্বা কালিদাস কবি,
মগ্ন হ'য়েছেন থিওরি চিন্তাতে।
বুড়া হ'লে যখন চাল্‌সে ধরে চোকে,
চস্‌মা ব্যবহার তখন করে লোকে,
তবু পরাধীন ব'লে ধরে না অনেকে,
ঐ আভরণ হ'য়েছে কালেতে।
জোর ক'রে কেবল বিজ্ঞতা জানান,
অলীক আড়ম্বর আর দেশে কেন,
ছেলে বুড়ো সাজা সাজে না কখন,
হাস্যাস্পদ কেবল হওয়া সমাজেতে।

দেশ জুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা ঢেউ,
বাড়ী বাড়ী দাড়ি বাকি নাইকো কেউ,
রাখেন না যারা পোঁদে আছে ফেউ,
মনোদুঃখে তারা ম'লো আপ্‌শোষেতে।
না বুঝে অনেকে নিগূঢ় কৌশল,
অনুকরণেতে অগ্নি হন পাগল,
সাধ ক'রে কেবল সাজা রামছাগল?
চেহারা কেবল পাই দেখিতে।
চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান,
চেহারায় চোকে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুয্যে কি রসুলবক্স রমজান,
অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।
দাড়ি রাখে লোকে হ'লে মহারোগ
দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ
কামান পয়সাটা পায় না নাপিতে।
প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী,
নকল তুলে নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি,
সাহেবেরা চটে দেখে চাঁপদাড়ি,
কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে।

— **প্যারীমোহন কবিরত্ন**

থিয়েটার সঙ্গীত

কবির সুর

দেশ মজালে ছেলে বকালে, মাগীর লাজ খেলে।
(যত) খ্যাদান ছেলে, মিলে জুলে, থিয়েটার খুলিলে।
কেলে বুড়ী যত মাগী, যারা সব মস্ত ঘাগী,
চুন মেখে সেজে পরী, ছোঁড়াদের মন ভুলালে।
(যত) বাঙ্গাল কাপ্তেন আর বাপ্‌খেকো ছেলে মজালে।
ছোঁড়াদের বুদ্ধি বেশ, মাগীদের সাজায় সরেশ,
কাউকে সাজায় 'কৃষ্ণ' 'বিষ্ণু' কাউকে সাজায় 'মহেশ'
তিন-কুলখেকো বেশ্যা যারা, দেবতা সাজে বেশ।

বামনা আবার নারদ সেজে, ভক্ত হ'য়ে ভক্তিতে ম'জে,
মাগীদের পায়ে প'ড়ে, দণ্ডবৎ করে সবিশেষ;
এর চেয়ে মজা আর কি আছে সরেশ!
দুনিয়ার চিড়িয়াখানা, সেথা ভুলে মন আর যেও না,
সব আপদ ঘুচে যায়, এ সব ছোঁড়া গেলে।
এমন সুখের দিন ভাই? বল কবে মিলে?

— ভুবনকৃষ্ণ মিত্র

নানারঙ্গ

মুসলমানী সুর

মাণিকপীর! ভবপারে যাবার লা।
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না।
আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার,
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভব-নদী পার।
সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল;
বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল।
কত কীর্ত্তি আছেরে ভাই, কওয়া নাইকো যায়,
দেখ সাদির সনে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।
ওরে কদু কুমড়ো রাখ্‌লে ফেলে তুশ্চু নেরেল ব্যাল;
আজগবি দুনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্যি ত্যাল।
মুসলমানের মোল্লারে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু;
কদু কুম্‌ড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।
আস্‌মানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ,
আর দিনের বেলায় সূয্যি ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ।
পাহাড়ে প্রকাণ্ড হাতী শিকলি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুর বাড়ী মেগের নাতি খায়।
কত কেরামৎ জানরে বন্দা, কত কেরামৎ জান;
মাজ দরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় ব'সে টান।
দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়;
আর পূজো পালি বাঁজা বিবির ছাওয়াল করে দেয়।
রাতির বেলায় ভূতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়কো মেয়ে থম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।
বিরহিণী বিবি আমার গো বাঁধে নাকো চুল,
কল্‌জেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।

সায়েরে গিয়েছে স্বামী, হাব্‌লি আঁধার ক'রে;
পরাণ জ্ব'লে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে, বিবির ভাসে যাচ্ছে হিয়ে;
খসম যদি থাক্‌ত কাছে রে পুঁচতো রুমাল দিয়ে।
পিঁড়েয় ব'সে কাদছে বিবি ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধ'রেছে ঠাসে, খসম খসম ব'লে।
যাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মান্‌ষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বলরে ভাই, পালা কল্লাম শেষ।

— দীনবন্ধু মিত্র

পৌষ-পার্ব্বণ

আড়ানা-বাহার—আড়খেমটা

এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই, জুট্‌লনাকো পুলি পিঠে।
যে মার্ঘ্যির বাজার, হাজার হাজার, ম'রতেছে লোক কপাল পিটে।
ফ'সকে গেল আস্‌কে খাওয়া, চেলের পাশে যায় না চাওয়া,
তিল নারিকেল ডেলের দাওয়া, টাকায় দুখান নাগরি চিটে।
গিন্নি মাগীর বদন বাঁকা, হাতে মাত্র দুগাছ শাঁখা,
সময়ে না পেলে টাকা, কপাল ভাঙ্গে আদত ইটে।
পৌষ পার্ব্বণ গেল সাদা, হ'ল না বাউনি বাঁধা,
ঘরে ব'সে মিছে কাঁদা, ম'লেই যাবে সকল মিটে।
জ্ঞাত কুটুম্ব দুঃখে মরে, চাল কোটা নাই কারও ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হ'য়ে, মরে কেবল মাথা কুটে।
যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে, বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে,
নানামত গোড়ে তারা, খাচ্চে সদাই বেটে চেটে।
মুখের পানে ছিলেম চেয়ে — "দুখান একখান যাওনা খেয়ে"
একটী বারও এমন কথা, ব'ল্লে না কেউ মুখটি ফুটে।

— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শিরোনামহীন

কালাংড়া—কাওয়ালী

কোথায় হে মাছধরা নাগর, মিছে আমায় টোপ্‌ দেখালে।
এতো নহে চুনা পুঁটি, ধ'র্‌বে তুমি গুটি গুটি,

ধ'রলে পরে ছিঁড়বে গুটী, গোটা দুই হাঁপালে।
আমি থাকি গভীর জলে, পড়ি না ধীবরের জালে,
সামান্য বঁড়শীর ছলে, কার সাধ্য আমায় তোলে।

— অজ্ঞাত

শুকসারি-সম্বাদ

খ্যাঁদা-খেঁদির পালা

ইডিন বন বিলাসিনী খেঁদি আমাদের,
খেঁদি আমাদের খেঁদি আমাদের
আমরা খেঁদির খেঁদি সকলের।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা কল্কি অবতার।
সারি বলে আমার খেঁদি কিম্ভূত কিমাকার,
নইলে মানাবে কেন?
শুক বলে আমার খ্যাঁদা কেমন সাবান মাখে,
সারি বলে আমার খেঁদি পাউডারে রং ঢাকে,
কোথায় সাবান লাগে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার বামে টেরি কাটা,
সারি বলে খেঁদির মাথার মাঝখানেতে ফাটা,
সিঁতের বাহার কত?
শুক বলে আমার খ্যাঁদার ফ্রেঞ্চকাট্ হেয়ার,
সারি বলে আমার খেঁদি করে নাকো কেয়ার,
কার্‌ল কুঁকড়ে পড়ে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার পমেটম চুলে,
সারি বলে খেঁদির চুলে কত শালা ঝোলে,
কোথায় খ্যাঁদা লাগে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা হ্যাট্‌কোট পরে,
সারি বলে আমার খেঁদি আড়ঘোমটা মারে,
ঘোমটার বাহার কত।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা তান ধরিয়ে দেয়,
সারি বলে আমার খেঁদি গাহনাতে মাতায়,
সে যে মিঠে আওয়াজ।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা পুরুষের মণি,
সারি বলে খেঁদি আমার ত্রৈলোক্যতারিণী,
খ্যাঁদার মাথায় থাকে।

শুক বলে আমার খ্যাঁদা কোর্টসিপ করে,
সারি বলে সেতো কেবল আমার খেঁদির তরে,
নইলে কিসের লাগি।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা বড় চাক্‌রি করে,
সারি বলে আমার খেঁদির সুপারিসের জোরে,
খ্যাঁদায় চেনে কে রে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা খবরের কাগজ লেখে,
সারি বলে আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে,
দুয়ের কোনটা ভাল?
শুক বলে আমার খ্যাঁদার রূপে ঘর আলো,
সারি বলে আমার খেঁদির চোখেই জগৎ মলো,
রূপের গুমর কিলো।
শুক বলে আমার খ্যাঁদাকে লোকে 'মিষ্টার' বলে ডাকে,
সারি বলে খেঁদিকে 'মাইডিয়ার' ব'লে খ্যাঁদা ডাকে,
মধুর কোন্‌টা হ'লো।
শুক বলে বোকোনা খ্যাঁদা খেঁদির ভাতার,
সারি বলে "ডাইভোর্স" বোঝ? কি জারি খ্যাঁদার,
খেঁদিকে চটাস্‌নাকো!

— অজ্ঞাত

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই গানগুলি মুদ্রণের সময় কিছু অনিবার্য মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করা ছাড়া, হুবহু প্রাচীন বানান রাখা হল।)

কবি পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — (১৮১২-১৮৫৯) শিয়ালডাঙ্গা- নীলকুঠি-কাঁচড়াপাড়া। হরিনারায়ণ গুপ্ত। বাঙালি কবিয়াল রচনারীতির কবি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খণ্ড কবিতা রচনার প্রবর্তক। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কবিতাপাঠের প্রবর্তক। সাধারণ মানুষের ভাষায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে তিনি বিখ্যাত। সে যুগের কোন লোকই গুপ্ত কবির বিদ্রূপ থেকে রক্ষা পাননি। সাংবাদিকতায় অসাধারণ কৃতি। ১৮৩১ সালে যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রকাশ এবং পরবর্তী সময়ে ' পাষণ্ডপীড়ন', 'সংবাদ রত্নাবলী', 'সংবাদসাধুরঞ্জন' ইত্যাদি পত্রিকার প্রকাশ। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত(নিধুবাবু), রামমোহন বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরুঠাকুর, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন সভা-কবির ও পাঁচালীকারের রচনাসংগ্রহ প্রকাশ। 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকে ভাষা ও ছন্দে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ সুস্পষ্ট। তাঁর কাব্য অমর না হলেও স্বকীয়তার বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। ইতিহাসে তিনি যুগন্ধরের কবি বলে স্বীকৃত। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

অমৃতলাল বসু — (১৮৫৩ - ১৯২৯) দণ্ডিরহাট- বসিরহাট। কৈলাসচন্দ্র বসু। বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার। কৌতুকরসের স্রষ্টা ও অভিনেতা। অল্প কিছুদিন ডাক্তারী পড়ার পর ছেড়ে দিয়ে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন পুলিশ বিভাগেও চাকরি করেছেন। ১৮৭২ খ্রী. ' নীলদর্পণ' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিনেতার জীবন শুরু হয়। এরপর তিনি গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখের নির্দেশনায় ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটকগুলি হল ' তিলতর্পণ ', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'খাসদখল', 'ব্যাপিকা-বিদায়' ইত্যাদি। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে তিনি 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন। ইংলণ্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে উকিল জগদানন্দের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত নাটক 'গজদানন্দ'র জন্য আদালতে দণ্ডিত হন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ', 'পুরাতন পঞ্জিকা', 'ভুবনমোহন নিয়োগী' তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা।

আনন্দচন্দ্র মিত্র — (১৮৫৪-১৯০৩) বজ্রযোগিনী - ঢাকা। বঙ্গচন্দ্র মিত্র। ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য। শিবনাথ শাস্ত্রীর গুপ্তচক্রের সদস্য। বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কালে মহাকাব্য রচয়িতাদের অন্যতম। তাঁর রচিত মহাকাব্যের মধ্যে 'মিত্রকাব্য', 'হেলেনাকাব্য', এবং ' ভারতমঙ্গল' বিখ্যাত। কাব্য ছাড়া গদ্য ও পদ্যে পাঠ্যপুস্তক

এবং রাগপ্রধান সঙ্গীতের রচয়িতা। এককালে তাঁর 'পদ্যসার', 'পদ্যশিক্ষাসার', ' কবিতাসার' প্রভৃতি নীতিমূলক কবিতা ছাত্রসমাজে সমাদৃত ছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ — (১৮৪০ - ১৮৭০) জোড়াসাঁকো - কলকাতা। নন্দলাল সিংহ। মাত্র তিরিশ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্যে ও সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৫ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা এবং ১৮৫৬ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী' থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ' নীলদর্পণ' নাটকের জন্য লঙ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা তিনি দিয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহকে জনপ্রিয় করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা এবং বহুবিবাহরোধ ও বারবনিতা- স্থানান্তরীকরণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটক 'বাবু' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রীসত্যবান' (১৮৫৮) ইত্যাদি। ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২-৬৪) সমাজজীবনের কিঞ্চিৎ স্থূল ব্যঙ্গরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় মহাভারতের অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সরকার কর্তৃক ' অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ' ও 'জাস্টিস্ অফ দি পীস' নিযুক্ত হয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ — (১৮৪৪-১৯১২) বাগবাজার - কলকাতা। নীলকমল ঘোষ। প্রখ্যাত নাট্যকার, কবি ও অভিনেতা। প্রথম জীবনে তিনি ' হাফ- আখড়াই ' দলের বাঁধনদার ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রী. বাগবাজার সখের যাত্রাদল প্রযোজিত মধুসূদনের ' শর্মিষ্ঠা ' নাটকের গীতিকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সধবার একাদশী ' নাটকে ' নিমচাঁদ ' চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৮০ খ্রী. ১০০ টাকা বেতনে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র ম্যানেজার হন। প্রথম রচিত মৌলিক নাটক 'আগমনী ' (১৮৭৭)। স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনার পর ১৯০৮ থেকে মিনার্ভার নাট্যাধ্যক্ষ হিসেবে আমৃত্যু কাজ করেছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, রামকৃষ্ণদেব তাঁর 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখে প্রভূত প্রশংসা করেন। সারাজীবনে তিনি প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেন। তিনিই প্রথম 'ম্যাকবেথ' নাটকের সার্থক বাংলা অনুবাদক। পৌরাণিক নাটকগুলিতে তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ 'গৈরিশ' ছন্দ নামে বিখ্যাত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'দক্ষযজ্ঞ','জনা', পাণ্ডবগৌরব', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', ' সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম ', 'কালাপাহাড়', 'আবুহোসেন' প্রভৃতি। 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁকে ' বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন।

গোপাল উড়ে — (১৯শ শতাব্দী) জাজপুর - কটক। মুকুন্দ করণ। চাষী পরিবারে জন্ম। তাঁর সুকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে যাত্রাদলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দলভুক্ত করেন। এরপর তিনি সঙ্গীতশিক্ষা ও বাংলাভাষা আয়ত্ত করেন। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে এক সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গের যাত্রা,

'বিদ্যাসুন্দর' পালার প্রথম অভিনয়ে 'মালিনী'র ভূমিকায় নৃত্যগীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। যাত্রাদলের অধিকারীর মৃত্যুর পর নিজেই দল গঠন করে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে নতুন রূপ দান করেন। টপ্পার সুরে গাওয়া 'বিদ্যাসুন্দর' পালার গানগুলো বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। উড়িষ্যার অধিবাসী বলে তাঁর দল 'গোপাল উড়ের যাত্রাদল' নামে খ্যাত ছিল।

দাশরথি রায় — (১৮০৬ - ১৮৫৭) বাঁধমুড়া-বর্ধমান। দেবীপ্রসাদ রায়। পদ্যরচনায় তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। এইসূত্রে পরে তিনি আকা বাঈ'র (অক্ষয় কাটানী) দলে যোগ দেন। ১৮৩৬ খ্রী. তিনি নিজস্ব পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন। কবি-গানের ঝাঁঝালো ছড়া, চাপান-উতোর ভঙ্গী সহযোগে তিনি পাঁচালীর নববিন্যাস করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকাররূপে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের প্রশংসিত হন। বর্ধমানের মহারাজা, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। তিনি ৬৮টি পালা রচনা করেন। কালক্রমে তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। তাঁর পাঁচালী সাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যবোধ, ধর্মবোধ ও সমাজচেতনা জাগাতে সমর্থ হয়েছিল।

দীনবন্ধু মিত্র — (১৮৩০ - ১৮৭৩) চৌবেড়িয়া- নদীয়া। কালাচাঁদ দত্ত। পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। অল্পবয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং পিতৃব্যের গৃহে থেকে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন। লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে 'দীনবন্ধু' নাম গ্রহণ করেন। কলেজের পরীক্ষায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। কলেজজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এসে 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর কোন কোন রচনা ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। নীলকর চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে ১৮৬০ খ্রী. তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন। এ নাটক ইতিহাস সৃষ্টি করে। মধুসূদন দত্ত কৃত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ পাদ্রী লঙ্ সাহেব স্বনামে ছেপে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তার রচিত অন্যান্য নাটকের মধ্যে ' সধবার একাদশী', ' জামাই বারিক ', ' নবীন তপস্বিনী ', ' বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'লীলাবতী ', ' কমলে কামিনী ', প্রভৃতি বিখ্যাত।

ধীরাজ — (১৯শ শতাব্দী) কলকাতা। পিতৃনাম অজ্ঞাত। কলকাতার প্রখ্যাত স্বভাবকবি ও গায়ক। তাঁর বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত ও মজার গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ করে যে গান রচনা করেছিলেন তা শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁকে পুরস্কৃত করেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে ধীরাজ ' দীনবন্ধু মিত্রে'র ছদ্মনাম। নীলচাষীদের নিয়ে লেখা গান ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় — (১৮৫২ -১৯১০) পশ্চিমপাড়া - ঢাকা। কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৩ সাল অবধি লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস

ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'The Jatras or the Popular Dramas of Bengal ' থিসিসের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ইউরোপে তিনিই প্রথম ভারতীয় পি. এইচ.ডি। অধ্যাপনাকর্মেও ইউরোপে তিনি প্রথম বাঙালি। ১৮৮৩ সালে স্বদেশে ফেরার পর তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর রচিত বিভিন্ন বই ব্যাপক সমাদৃত। বিদেশ যাত্রার আগে 'অবলা বান্ধব' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী ও ' বাল্য-বিবাহ-নিবারণী' সভা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমাজসংস্কারকের ভূমিকা খুব স্পষ্ট। গান রচনা করা ছাড়াও তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন। শেষজীবনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়ে ১৯১০ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

প্যারীমোহন কবিরত্ন — (১৭৫৬ শকের ৪ঠা আশ্বিন - জন্ম) অন্তঃপাতী সাহাজুই -বর্ধমান। দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। খুল্লপ্রপিতামহ কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। প্যারীমোহন তাঁর সময়ের বিখ্যাত কবি। বাল্যকালে পিতা ভালোভাবে শিক্ষিত করতে চাইলেও পড়াশোনার চেয়ে গান রচনা এবং পদ্য লেখায় তাঁর মনোযোগ বেশি ছিল। তিনি কলকাতার ধনীসমাজে স্বরচিত সঙ্গীত গেয়ে অজস্র শ্রোতার মনোরঞ্জন করতেন। তাঁর ভাবপূর্ণ গানগুলো বঙ্গদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। তাঁর গানে বর্ধমানের মহারাজা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীমোহন কবিরত্নের দেহাবসান হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় — (১৮৪৯ -১৮৯৪) রামচন্দ্রপুর- বর্ধমান। পিতৃনাম অজ্ঞাত। বিশিষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাস লেখক। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে 'বীণা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও নাটক প্রকাশিত হত। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে 'বীণাযন্ত্র' প্রেস স্থাপন করেন। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে 'বীণা'- রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা এবং স্বরচিত পৌরাণিক নাটক 'চন্দ্রহাসে' অভিনয়। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে স্টার থিয়েটারের বেতনভোগী নাট্যকার। বিদ্রূপাত্মক কবিতার সাহায্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার ও জাতীয় চেতনা সঞ্চারে সাহায্য। রচিত গ্রন্থ 'পতিব্রতা', ' নাট্যসম্ভব', 'তরণীসেন বধ', 'লায়লা মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল' ইত্যাদি। এছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন। সম্ভবত প্রথম বাঙ্গালি যিনি সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করেন। ' হরধনুভঙ্গ' নাটকে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। 'বর্ষার মেঘ' কবিতায় ও ' রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে তাঁর গদ্য কবিতা রচনার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। ' ভারতকোষ' নামে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত প্রথম বিশ্বকোষের (১২৮৯- ১২৯৯ব.) সংকলক তিনি ও শরচ্চন্দ্র দেব।

রাধানাথ মিত্র — (১২৩২ - ১৩২৮বঙ্গাব্দ) জেজুর-হুগলী । কলকাতা শীল্স্ ফ্রী কলেজের প্রধান শিক্ষক ও কবি। কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও রহস্যকাহিনী প্রণেতা। 'বাঙ্গালী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'গোরাচাঁদ', 'ঘরের ছবি', 'লালকুঠি', 'প্রণয়প্রসঙ্গ', 'জোড়া ডিটেকটিভ' প্রভৃতি।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়— (?) জোড়াসাঁকো -কলকাতা। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী কয়েকজন

ভদ্রসন্তান নিয়ে 'নন্দবিদায়' নামে নতুন ধরনের যাত্রাপালার অভিনয় শুরু করেন (মার্চ ১৮৪৯) যাতে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করত। তিনি প্রথম অবস্থা থেকে জোড়াসাঁকোর হাফ-আখড়াই দলের সম্পাদকতা করেন। নিজে সুরসিক কবি ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। 'নন্দবিদায়' যাত্রাপালার গান ও সুর তার স্বরচিত।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় — (১৮২৬ - ১৮৯৫) তারপাশা-বিক্রমপুর-ঢাকা। পিতৃনাম অজ্ঞাত।অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন। পিতৃব্য তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিপালিত। কুলীনবংশজাত বলে দারিদ্রের কারণে পিতৃব্য তারকচন্দ্র তার আটবার বিবাহ দেন। এর জন্য রাসবিহারীর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার কুফল আলোচনা করে তিনি 'বল্লালসংশোধনী' নামে গ্রন্থ ও বহু গান রচনা করেন। পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলনে তিনি বিদ্যাসাগর ও রেভা. জেম্‌স লঙ্‌ের সমর্থন পান। আত্মজীবনী 'সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত'র আগাগোড়াই কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস। তার কাব্যগ্রন্থ 'রমণীরমণ', 'বিদ্যানিধি', 'শৈশবজ্ঞান চন্দ্রিকা' ইত্যাদি।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর — (১৮৪০-১৯১৪) পাথুরিয়াঘাটা-কলকাতা। হরকুমার ঠাকুর। হিন্দু কলেজে বাংলা ও ইংরেজি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন। হিন্দুসঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭১ খ্রী. হিন্দুমেলা উৎসবে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রকাশ্য সভায় সঙ্গীত আলোচনায় তিনি পথ প্রদর্শক। ১৮৭৫ খ্রী. ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৯৬ খ্রী. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ' ডক্টর অফ মিউজিক' হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই উপাধি পান। পারস্যের শাহ্‌র কাছ থেকে 'নবাব শাহজাদা' উপাধি পান। ১৮৮০ খ্রী. 'সি. আই. ই' ও পরে ১৮৮৪ খ্রী. বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'Knight Bachelor of the United Kingdom' উপাধি পান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং 'জাস্টিস্ অফ দি পীস' ছিলেন । নাটক রচনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। রচিত অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুক্তাবলী' (নাটক), 'সঙ্গীতসার -সংগ্রহ', 'জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব', 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা', 'মৃদঙ্গমঞ্জরী', 'একতান', 'যন্ত্রকোষ' প্রভৃতি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — (১৮৩৮-১৯০৩) গুলিটা-হুগলি। কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশপ্রেমিক যশস্বী কবি। ১৮৫৯ খ্রী. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে প্রথমে মিলিটারি অডিটার-জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজ করেন এবং কয়েকবছর পর ওকালতি শুরু করেন। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১৮৭৫-৭৭/২ খন্ড)। জুলাই ১৮৭২ খ্রী. তার 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন। 'ভারতবিলাপ', 'কালচক্র', 'বীরবাহুকাব্য' প্রভৃতি রচনায় তিনি নির্দ্বিধায় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করেছিলেন। কাব্যের মাধ্যমে নারীমুক্তি, বিধবা রমণীদের উপর অত্যাচারে আঘাত হানেন।

তার 'কুলীন মহিলা বিলাপ' কবিতাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহরোধ আন্দোলনের সহায়ক হয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই মহান কবি অন্ধ হয়ে চরম দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটান। 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা' 'কবিতাবলী' তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার অন্যতম।

যেভাবে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে

প্রথমে কবির নাম। তারপর বন্ধনীর মধ্যে প্রথমটি জন্মসাল, দ্বিতীয়টি মৃত্যুসাল। এরপরে জন্মস্থান এবং তারপর পিতার নাম। সবশেষে কবি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাবলী।
তথ্যসূত্র : 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' ও ' বিশ্বসঙ্গীত'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যে সব লেখকের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না তাঁরা হলেন **দুর্মুখ নন্দী, রাধামোহন মিত্র, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ অধ্যেতা, কুবির দাস গোঁসাই, আনন্দচন্দ্র দাস, কাঁড়াদাস, তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন, দীন বাউল, নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ ফকির, কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি, রামরতন ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, বিদ্যাভূনী, ভুবনকৃষ্ণ মিত্র।** এইসব লেখকদের জীবনী সম্বন্ধে কোনো তথ্য যদি কোন আগ্রহী গবেষক আমাদের লিখে জানান বিভাবে'র পরবর্তী কোন সংখ্যায় তা প্রকাশিত হবে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

‘হিন্দুসঙ্গীত ও স্যার রবীন্দ্রনাথ’

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি

(যাদুমণি দেবীর পরামর্শক্রমে ১৯১৭ সালে রচিত)

প্রস্তাবনা

'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯১৭) রচনা। তৎকালীন 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' পক্ষ থেকে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরি মহাশয়ের সভাপতিত্বে, রামমোহন লাইব্রেরিতে আয়োজিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীততত্ত্ব এবং সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তাল বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখেছিলেন এবং তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ সভায় উপস্থিত সঙ্গীতকলাবিদ্‌রা, রবীন্দ্রনাথ উত্থাপিত প্রশ্ন, আপত্তি ও আশঙ্কার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। পরে এই প্রবন্ধটি সবুজপত্রের ভাদ্র (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

এর অল্পদিন পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীতানুরাগী লব্ধপ্রতিষ্ঠ মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে 'সঙ্গীত পরিষদে'র পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিবৃত তার বক্তব্যের প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করা হয়। তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উত্থাপিত প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেন 'সঙ্গীত পরিষদে'র প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধটি একযোগে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণির গবেষণাপত্র ও আলোচ্য সভার বিবরণ। তৎকালের বিখ্যাত ধ্রুপদ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতি যাদুমণি দেবীর অর্জিত সঙ্গীতজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। সুর তাল সম্বন্ধীয় যে সব গুরুতর বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে তা যাদুমণি দেবীর গভীর সঙ্গীতজ্ঞানেই সম্ভব হয়েছিল। 'সঙ্গীত পরিষদে'র ভাইস প্রিন্সিপাল পদে আসীন শ্রীমতি যাদুমণি দেবীর সঙ্গীতশাস্ত্র ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিলো প্রবন্ধটি যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়।

আমরা এই বইটি অবিকৃত রেখে তৎকালে প্রচলিত মূল বানানরীতিকে পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র কিছু অনিবার্য মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করে প্রকাশ করলাম। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভাল বইটি অজস্র মুদ্রণপ্রমাদে ভর্তি এবং বইটির পেছনে যাদুমণিকৃত রবীন্দ্রকবিতার সুরসংযোগেও এই ত্রুটি বর্তমান। এটুকু বাদ দিলে বইটির অসাধারণ তত্ত্বগত দিক আমাদের বইটিকে পুনঃপ্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

নতুন সহস্রাব্দে অধুনা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এই বইটির পুনঃপ্রকাশ রবীন্দ্রচর্চার নতুন দিক খুলে দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা চাই রবীন্দ্রসঙ্গীততত্ত্ববিদেরা বইটির তত্ত্বগত দিক সম্বন্ধে অবহিত হন ও প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন। এই প্রবন্ধে 'স্যার রবীন্দ্রনাথ' বাক্যবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তখনও রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেননি। বইটিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত বাক্যবন্ধের মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করে দিয়েছেন শ্রীমতি রত্না বসু। এর পরেও কোন মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেলে সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী।

(বইটি শ্রী দীপক দে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত)

The Sangit Parishad

A MUSICAL DEMONSTRATION

Hindu Music and Sir Rabindranath

(Amrita Bazar Patrika, Saturday, Dec.15, 1917-**A report**)

The Musical demonstration given by the **Parishad** by way of a protest against the latest utterances of Sir Rabindranath Tagore on" Indian Music" came off last Friday evening at the Presidency Theatre. On the motion of Rai Yatindra Nath Chowdhury, Babu Mati Lall Ghose was voted to the Chair.

The demonstration opened with two *Dhrupad* songs by **Sm. Jadumani Devi** and Prof **Jogendra Kishore Banerjee** both of the Parishad Vidyalaya. Babu Krishna Chandra Ghose then read his paper which was, explained by practical demonstrations. He began by explaining the fundamental principles of Hindu Music which are based on the Indian theory of Accoustics. He explained how the permutation and combination of vowels and consonants expressed the inner feelings from which **Ragas** were evolved in time and how all these evolutions must necessarily be rythmical — all motions being fundamentally rythmical. Coming to the question of time and evolution of rythm and music in poetry, the writer protested against Sir Rabindranath's idea of slackening the rigidity of rythmical time in Indian music, as it would be killing the music itself. The poet's test-sonnets given in his essay – "**Sangiter Mukti**" were then analysed and it was pointed out that the metres of these compositions were not new as alleged. All the sonnets were put to the tune and were sung in perfect accordance with the time measures given by the composer but conforming to the musical rythm (Tâl) from standard Indian Works on Music. These songs were again sung in the traditional way prevailing in Bengal setting them in current musical rythm. The speaker thus justified the latitude and freedom which a finished musician could enjoy in enhancing the power, beauty and charm of a piece of sonnet without violating in the least the genius of the same as questioned by

the poet. It was further pointed out that none of the musical time measure involved in **Tâls** – *Ekadasi, Navatâla* and *Rupkadâ*– alleged to have been created by the poet , were new; and that they were all to be found in old sanskrit works on music. It appeared that these particular rythms have only got new nomenclatures from Sir Rabindranath. Referring to the creation of new **Tâls** in music, the speaker denied the possibility of any new creation that could not be ferreted out of standard works in Sanskrit.

In reply to the poets contention that there were no Indian tunes which could with propriety be set to ' heroic' or 'Jovial' songs without any European intonation, practical demonstration of such songs were given proving the existence of suitable tunes in Hindu Music.

Referring to the relative position of music and poetry, **Babu Krishna Chandra** explained how a finished musician was superior to the poet ; for the latter must follow the laws of music in composing his sonnets. He said that what Sir Rabindranath had attempted in his essay was not to '**release music**' but to **fetter the musician for the enjoyment of greater license by the poet himself**——which is not compatible with the spirit of democracy of the rising generation.

After a few dances in accompaniment of Mridanga in **Chautâl** and **Teorâ** and another song by **Lady-Vice Principal of the Vidyalaya,** the demonstration was brought to a close by **Prof : Chittaranjan Goswami,** the inimitable humourist exhibiting his satirical skit–**Mool Raga** and **Prachanda Tal** bearing on the gesticulations of **Ostâds**, which put the house in a roar of laughter.

With a few well chosen remarks by the President on the performance of the evening and the utility of the cultivation of music on **national lines** the meeting dissolved.

পরিচয়

মধ্যে হিন্দুসঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের যেমন অশ্রদ্ধা হইয়াছিল, এখন আর সে ভাব নাই। আমাদের দেশে পূর্ব্বে গীত-বাদ্যের চর্চ্চা যেরূপ হ্রাস পাইয়াছিল, তাহার তুলনায় আজকাল যে ইহার চর্চ্চা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্ববিশ্রুত প্রাতঃস্মরণীয় রাজা স্যার ˚সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আমাদের দেশে হিন্দুসঙ্গীতের এই আদর ও চর্চ্চা বৃদ্ধির মূলহেতু ও নায়ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন বিদেশীয় সঙ্গীত-তত্ত্ববিদেরা ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যাকে ললিতকলার দৃগভূমি হইতে পরীক্ষা করিতে, এবং যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত তাহার অসারত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা করেন, তখন রাজা স্যার ˚সৌরীন্দ্রমোহনই তাহার তীব্র প্রতিবাদ লিখিয়া হিন্দুসঙ্গীতের মর্য্যাদা যে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা নহে; হিন্দুসঙ্গীত বিষয়ক সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী বিবিধ গ্রন্থাদির পুনরুদ্ধার, সংকলন ও রচনাদির দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় জগতেই ললিতকলা হিসাবে ইহার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাহারই ফলস্বরূপে আজ আমরা শিক্ষিত জনমণ্ডলীমধ্যে হিন্দুসঙ্গীতের দিন দিন আদর ও চর্চ্চা বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের পর, অপর কোন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গুণী হিন্দুসঙ্গীত লইয়া এবম্বিধ আলোচনা করিয়াছিলেন কিনা জানিনা।

সম্প্রতি দেখিতেছি, A.H.Fox Strangways নামক প্রতীচ্য কোন শিক্ষিত সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি তাঁহার ভারত পর্য্যটনের ফল স্বরূপে, "Music of Hindusthan" নামক একখানি সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জনসমাজে তাহার প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে হিন্দু সঙ্গীতের সামান্য সামান্য প্রশংসা বাক্য থাকিলেও, ইহা যে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি অস্বীকার ও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি, ক্রান্তদর্শী — নহেন; বর্ত্তমানে তাঁহাকেই মূর্ত্তীমান হিন্দুসঙ্গীত রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"···may be said to personify Indian music in its broadest sense".কবিবর বিলাতী "নোবেল" প্রাইজ লাভ করিবার পর তিনি যেমন অধুনা হিন্দুধর্ম্ম ও নীতি লইয়া বিকৃত বিবিধ শ্লেষপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেইরূপ হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি বেশ একটু তীব্র দু-চার কথা বলিতেছেন। সম্প্রতি "সঙ্গীতসঙ্ঘের" পক্ষ হইতে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে, রামমোহন লাইব্রেরীতে, 'সঙ্গীতের মুক্তি' শীর্ষক এক প্রবন্ধ স্যার রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন।

এই প্রবন্ধটি সবুজ পত্রের ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগর্ভস্থ অনেক কথাই Strangways সাহেবের গ্রন্থমধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই কথাগুলি হয় তাঁহার নিজস্ব, অথবা তিনি Strangways সাহেব-ধৃত মতের পরিপোষক। যে পক্ষই গৃহীত হউক না কেন, হিন্দুসঙ্গীতের মর্য্যাদা শিক্ষিতসমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, প্রোক্ত প্রবন্ধগর্ভস্থ কথাগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় আবশ্যক। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই মহানগরী কলিকাতাতে কোন সঙ্গীততত্ত্ববিদ স্যার রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত আপত্তি ও আশঙ্কার কোন মীমাংসা বা সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই। কলিকাতায় খাঁ সাহেব, মিয়া-সাহেব, রাও-সাহেব, সঙ্গীত-

বিদ্যার্ণব প্রভৃতি বহু বহু যন্ত্রী, ধ্রুপদীয়া, খেয়ালিয়া, সঙ্গীতশাস্ত্র ব্যাখ্যানকর্ত্তা আছেন। যখন প্রবন্ধ পাঠ হয় তখন ইঁহাদের মধ্যে কেহই যে উপস্থিত ছিলেন না, এমন নহে। তাঁহারা যখন কেহই ইহার সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই, তাহাতে আমাদের এই মনে হয় যে, হিন্দুসঙ্গীতের মূলে নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। সকলেই তোতাপাখীর ন্যায় বিনা মর্ম্মগ্রহণে অভ্যাস করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু কিসে-যে-কি হয়, যাহার অনুসন্ধানেই মানবের মানবত্ব, এবং যদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেক সঙ্গীতে যখন কোনও নূতন সৃষ্টি অসম্ভব,—সেই অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদির সমাচার বড় একটা কেহই রাখেন না। ইহা অতীব দুঃখের কথা। এই জন্য আমরা সঙ্গীতচর্চ্চার আশানুযায়ী ফল পাইতেছি না।

আরও এক কথা। প্রচলিত পথের একটু বাহিরে পড়িলেই আমরা কেমন বিভ্রান্তচিত্ত ও দিঙ্মূঢ় হইয়া পড়ি, এবং পরে আসিয়া অযথা বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিলেই আমরা রাঘবাঞ্ছার ন্যায় আধাঁর কুটিরে নীরবে ক্রন্দন করি। বিষয়বিশেষের ঔপপত্তিকাংশকে নিরন্তর অগ্রাহ্য করাই ইহার একমাত্র কারণ। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। 'সঙ্গীত পরিষদে' ভারতীয় সঙ্গীতের ললিতকলাভাবে যথাযথ চর্চ্চা ও ইহার ঔপপত্তিকাংশের বিশেষ গবেষণা ও আলোচনা হয় বলিয়াই বিগত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্সি রঙ্গমঞ্চে, সঙ্গীতানুরাগী লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'সঙ্গীত পরিষদ' হিন্দুসঙ্গীতের পক্ষ হইতে স্যার রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদস্বরূপে বক্ষ্যমান প্রবন্ধ-পাঠ ও কবিদের রচিত গান তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী শাস্ত্রসিদ্ধ তাল-মান-লয়ে শিক্ষিত জনমণ্ডলী সমক্ষে গায়ন ও সঙ্গত রীতি প্রদর্শন করিয়া, কবিবরের কথার অসারতা প্রতিপাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতচর্চ্চা করেন, তাহারা যদি কথঞ্চিত ইহার ঔপপত্তিকাংশও আলোচনা করেন, তাহা হইলে যে হিন্দুসঙ্গীতে প্রাণের স্পন্দন সতেজে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে সন্দেহই নাই। ইত্যালমতি বিস্তারেন।

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।
সম্পাদক

"বেঙ্গল একাডেমী অফ্ মিউজিক" প্রদত্ত **সঙ্গীত - উপাধ্যায়** ও "ভারত - শ্রীধর্ম্মমহামণ্ডল" প্রদত্ত **সঙ্গীত - বিশারদ** উপাধিধারী **রায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর মহাশয়** লিখিয়াছেন, —

167, Manicktola Street,
কলিকাতা, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

"সঙ্গীতের মুক্তি", শীর্ষক প্রবন্ধে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাল সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার সমাধান করিয়াছেন। এ সমাধান তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে। সংস্কৃত সঙ্গীত ও ছন্দাদি শাস্ত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, স্যার রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধান্তর্গত সমস্ত পদ্যগুলির ছন্দের অনুরূপ ছন্দ শাস্ত্রগ্রন্থে প্রকটিত আছে। শাস্ত্রাবলম্বনে ঘোষ মহাশয় উহাদের নাম ও লঘু গুরুভেদে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুরে গ্রথিত হইয়া উক্ত পদ্যগুলি "সঙ্গীত পরিষদ" ভবনে এবং সাধারণ সভায় গীত হয়। আমি সেই গানগুলি শুনিবার অবসর পাইয়া বুঝিয়াছি যে, সে সকল গানে স্যার রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশিত ছন্দের গতি ও যতি অব্যাহত আছে। অবশ্য, এই সকল ছন্দ বর্ত্তমান হিন্দুস্থানের সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত নাই। সুতরাং ইহাদের জন্য শাস্ত্রোক্ত আঘাত ও বিরামভেদে ছন্দানুসরণ করিয়া ঠেকার 'বোল' প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। স্যার রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের ও অক্লান্তকর্ম্মা ঘোষ মহাশয়ের শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে, এই সকল ছন্দে রচিত গান যদি সাধারণের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে যে সেই সঙ্গে আর্য্য সঙ্গীতের পুষ্টিসাধন হইবে তাহা সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে ঘোষ মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্য সাতিশয় প্রশংসনীয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু

স্বনাম ধন্যা সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী

শ্রীমতি যাদুমণি দেবী

(ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল, সঙ্গীতপরিষদ বিদ্যালয়)

"সঙ্গীতপরিষদে"র পক্ষ হইতে পঠিত বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বস্তুত, আপনার সুমার্জ্জিত কণ্ঠ, ও অভ্রান্ত শিক্ষানৈপুণ্যের সাহায্য না পাইলে, আমি এই প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইতাম না। সুরতালাদি প্রভৃতি যে সমস্ত গুরুতর বিষয় এতন্মধ্যে আলোচিত হইয়াছে, তাহা আপনারই অসামান্য শিল্পচাতুর্য্যপ্রসাদেই সম্ভবপর হইয়াছে। আপনার সর্ব্ববিধ মুদ্রাদোষ বিবর্জ্জিত সুন্দর সুমিষ্ট আলাপরীতি দর্শন ও শ্রবণ করিলে, ওস্তাদভীতিরূপ পদার্থটি আর চীনদেশীয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল ইহাই নহে, আপনার অসামান্য কারুকার্য্য খচিত বিবিধ অলঙ্কার বিমণ্ডিত যাবতীয় রাগরাগিণীর গায়নাদি শ্রবণ করিলে, মুগ্ধ হইতে হয় এবং এই বিশাল বিশ্ব যে ছন্দ ও সঙ্গীতময়, তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধে ভাবকে ভাষাগত করিবার অবসরে সঙ্গীতশাস্ত্র ব্যাখানকালে, আমি যদি কোন ভ্রমে নিপতিত হইয়া থাকি, সে ভ্রম আমারই; আর যাহা কিছু শাস্ত্রসঙ্গত, প্রকৃত তথ্যের উপর স্থাপিত, তাহা আপনারই নিকট হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং ইহা প্রকাশের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার আপনাকে সাধুবাদ না দিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। ইতি। ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সাল, কলিকাতা।

বিনীত

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি।

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী যাদুমণি দেবী

(ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল, সঙ্গীত পরিষদ্ বিদ্যালয়)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রবাবুর যে সমস্ত গান প্রবন্ধগর্ভে আলোচিত হইয়াছে, গান হিসাবে সেগুলিতে বিশেষ কিছুই নাই। কারণ, কবিতা ও গান, একই বস্তু নহে। কবিতা গান নহে বলিয়া কেবল ছন্দ হিসাবেই তাহাদের পরীক্ষা করা হইয়াছে। আর গান হিসাবেও শাস্ত্রসিদ্ধ তাল যোগে তাহাদের সহিত সঙ্গত হইতে পারে কি না, তাহাও দেখান হইয়াছে। তালের ছন্দ প্রত্যেক গানের উপরে প্রদত্ত হইয়াছে; আর লয়াঙ্ক তাহার নিম্নেই দেওয়া হইয়াছে। গানগুলির স্বরলিপিও এই পুস্তিকার শেষে দেওয়া হইল। প্রকৃত হিন্দুসঙ্গীতের বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর যথাযথ-স্বরলিপি, বিশেষতঃ খেয়াল-টপ্পাজাতীয় গানের, সম্ভবপর নহে। যে কোন গানের স্বরলিপি করা হউক না, গানে গ্রথিত রাগ-রাগিণীতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বরলিপিতে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। আঁশমীড়াদি অলঙ্কার প্রভৃতি স্বরলিপি দৃষ্ট কণ্ঠ বা যন্ত্রে যথাযথ বাহির করাও অসম্ভব। সেইজন্য গান যেমন তেমন হউক না কেন, স্বরলিপির দ্বারা তাহাকে কঠিন নিগড়বদ্ধ করিলেই, তাহার পর্দ্দাগুলি কেমন খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া উঠে; এবং এতন্নিবন্ধনই তাহার আসল প্রাণটি বাহির হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত স্যার রবীন্দ্র বাবুর কবিতায় নিবদ্ধ মাত্রা ও ছন্দানুবর্ত্তী তালে গায়নাদি করিতে হইলে, তাহার স্বর-বিন্যাস "খাড়া-খাড়া"ভাবেই রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞ গায়কেরা কিন্তু ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত রাগিণীগুলিতেই যথাসম্ভব অলঙ্কারাদি বিমণ্ডিত করিয়া গায়নাদি করিতে পারিবেন। তালমৃদঙ্গ (তলমৃদঙ্গ?) বাদন বিষয়ে যাঁহারা সুনিপুণ, তাঁহারা ছন্দ হিসাবে আঘাত-বিরাম ঠেকার বাণী প্রস্তুত করিয়া সঙ্গতকরিতে পারিবেন। যাঁহারা এ বিষয়ে অক্ষম বা অনভিজ্ঞ তাঁহারা উক্ত ঠেকার বাণী ও রীতি শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য বিদ্যালয়ে পত্রের দ্বারা আবেদন করিবেন। ইতি —

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সাল
সঙ্গীত-পরিষদ-বিদ্যালয়

শ্রীমতী যাদুমণি দেবী
ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল

স্বরলিপিতে ব্যবহৃত সঙ্কেত

কোমল র = ঋ	স = একমাত্রা
কোমল গ = জ্ঞ	সা = দুইমাত্রা
কোমল ধ = দ	সা-া = তিনমাত্রা
কোমল ন = ণ	সা-া-া = চারিমাত্রা
কড়ি ম = হ্মা	ইত্যাদি।

স্বরের পূর্ব্বে বা পরে ক্ষুদ্র অক্ষরে সংযোজিত স্বর স্পর্শ-মাত্রা। দুইটি স্বরে মিলিয়া একত্রযুক্ত থাকিলে, দুইটি অর্দ্ধ মিলিয়া ($\frac{১}{২}+\frac{১}{২}$) একমাত্রা। তিনটি স্বর একত্রযুক্ত ($\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}$) থাকিলে, সেইরূপ একমাত্রার মধ্যে তিনটি স্বরই উচ্চারিত হইবে।

উদারার স্বর — নিম্নে ্ রেখা।
মুদারার স্বর — রেখাবর্জ্জিত।
তারার স্বর — মাথায় ´ রেখা।

হিন্দুসঙ্গীত ও স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

আজকাল ভাবরাজ্যে ও ব্যবহাররাজ্যে, জ্ঞান, দর্শন, চারিত্রের; সাহিত্য, শাস্ত্র ও কলাকৌশলের যেরূপ চালনা ও আলোচনা হইতেছে, তাহার "ঠাঠ্-ঠমক", লক্ষণালক্ষণ ও গতিবিধি, রাগবিরাগ শূন্য হৃদয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, আমরা এক যুগ পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে আসিয়াছি। ইহা আদর্শ বাস্তবের, প্রবীণ নবীনের, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। সন্ধ্যাই সন্ধিক্ষণ। দিবারাত্রসম্বন্ধিদণ্ডদ্বয়রূপই ইহার স্বরূপ। ইহাই সাধকের যোগ সঙ্কটাবস্থা। এই যোগ-সঙ্কটাবস্থায় অবিদ্যাস্বরূপিণী মায়া আসিয়া, আপনার মোহজাল বিস্তারপূর্ব্বক সাধককে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। সাধকের সিদ্ধি-সাধন পথে এই মায়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; নিত্য নবনব মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধককে বিমোহিত, আদর্শ হইতে বিচ্যুত করে। অথবা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিধারণান্তর সাধনার আসন হইতে তাহাকে বিতাড়িত করে। যিনি আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও একনিষ্ঠ, যিনি আপনার আদর্শের ধ্যান-মহিমায় বিভোরত্ব নিবন্ধন, অবিদ্যাস্বরূপিণী কুহকিনীর চরণ নূপুর মুখরিত ললিতঝঙ্কারে বধির; বিলাসিনী ললিতাঙ্গীর লালসা লোলুপ রূপ-তরঙ্গে যিনি অন্ধ; চিত্তবিভ্রমকারী কুসুম-সুবাসিত মৃদুমলয় হিল্লোলেও যিনি অবিচলিত; তিনিই কেবলমাত্র এই যোগসঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধির বিজয়মালা লাভ করিতে পারেন। জগৎপূজ্য তথাগত এই সাধন-সম্পত্তি-চতুষ্টয়ের বলেই সাধনায় 'মার'-বিজয়ী হইয়া 'বহুজনহিতায়সুখায়' বুদ্ধরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। শয়তান কর্ত্তৃক কল্টকাকীর্ণ সাধনার পথ অবলীলাক্রমে পার হইয়াছিলেন বলিয়াই খ্রীষ্ট আজ এই মহীতলে ত্রাণকর্ত্তারূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

ব্যক্তির জীবন যে নিয়মাধীন, জাতীয় জীবনও ঠিক সেই নিয়মাধীন। ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধিসাধন পথে যেমন যোগসঙ্কটাবস্থা আছে, জাতীয়জীবনের সিদ্ধিসাধনেও ঠিক সেইরূপ যোগসঙ্কটাবস্থা আছে। এই যোগসঙ্কটাবস্থাই জাতীয়জীবনের যুগপরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণই জাতীয়জীবনের সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাবসানে জাতীয়জীবনে কোমল রবিকরোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ মলয় সুবাসিত সুপ্রভাত আসিবে, কিম্বা ঘোর অমানিশার নিবিড়চ্ছায়া ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, তাহা আমাদের জাতীয়সাধকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। জাতীয়জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সাধক যদি আপন আদর্শের প্রতি হীনশ্রদ্ধ হয়েন, আপনার সাধনসম্পত্তি গণিয়াগাঁথিয়া হিসাব মিল না করেন, পরবৈভব দেখিয়া বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া যদি আপন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়েন, তাহা হইলে মায়াজাল বিজড়ন নিবন্ধন, আবার যে জাতীয় জীবনকে ঘোর অমানিশার নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

এই জন্য বলিতেছিলাম, আমাদের জাতীয়জীবনের সিদ্ধি-সাধন-সম্পত্তি গণিয়াগাঁথিয়া, হিসাব-নিকাশ মিল করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষ সমুদ্ভূত এই সঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, জাতির অস্তিত্ব-ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিবার জন্য, দুর্ব্বার জীবন-সংগ্রামে বিজয়মুকুট লাভ করিবার জন্য, ইপ্সিততমকে করতলগত করিবার জন্য, আমাদের শস্ত্রশাস্ত্রের, অর্থসামর্থ্যের হিসাবনিকাশ করিবার জন্য, জাতীয় জীবন-সংগ্রামের এই সন্ধিক্ষণই প্রকৃত উপযুক্ত সময়।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রাণ। এই জন্য আমাদের পূজ্যপাদ ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্মের খতিয়ান করিয়া বিশ্বসমাজে আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ আপনাদের খতিয়ান করিয়া, বিশ্বে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও চিত্রকলাবিদ্ আপন আদর্শ অন্বেষণে, তাহার পথ বহিষ্করণে এখন বেশ ব্যস্তত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। জাতীয়সাহিত্য পাঁজিপুঁথি বাহির করিয়া আপনার হিসাব মিল করিয়া লইতেছে। বাকী আছে কেবল জাতীয়-জীবনসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, — সঙ্গীত।

জাতীয়জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সঙ্গীত কলাকৌশলের হিসাব যদি মিল না করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের আদর্শানুযায়ী, ইহার সংস্কার ও প্রসার সুদূর পরাহত হইবে। এবং এখন হইতে যদি আমাদের সঙ্গীতের আদর্শানুযায়ী সংস্কার ও প্রসার না হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবন-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সংসাধিত হইবে না, এ কথা বোধ হয়, প্রেক্ষাবান মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তা'ই বোধ হয় আমাদের পূজ্যপাদ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, "সঙ্গীতের মুক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের সকলকেই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, —

"আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আমাদের আর তৃপ্তি নাই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন জাগরূক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম, আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড় পাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্ব যাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে, তবে ওর আর উদ্ধার নাই।"

'সঙ্গীতের মুক্তি!' বিষয়টি গুরুতর। গুরুতর বলিয়াই মনে হয় প্রবন্ধটিও দুরূহ। দুরূহ হইলেও প্রবন্ধটি যে মনোরম হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার বক্তব্য বিষয়ও 'হিন্দুসঙ্গীত'। কিন্তু 'সঙ্গীতের মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধটি আমার প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি মনোরম হইয়াছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার কথা সর্ব্বথা অনুমোদন করিবার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা নহে। সঙ্গীত সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিবার জন্য রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি আমার অবলম্বন করিবার প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন দুইচারিটি অবশ্য মীমাংসিতব্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, যদি সেগুলির শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে আজ না হয় কাল, প্রতীচ্য-কল্পনা প্রসূত Romantic Movement -এর প্রবল বন্যায় আমাদিগকে নিশ্চয় দেহ ভাসাইয়া দিতেই হইবে। এরূপ ঘটিলে কিন্তু আমাদের নিজত্ব-ব্যক্তিত্ব, আর আমাদের মুষ্টির মধ্যে থাকিবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলীই তখন আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইবে। তখন নিজেদের নিজত্ব-ব্যক্তিত্ব-বিশেষত্ব হারাইয়া আমাদিগকে তাহাদের হস্তে মৃৎপিণ্ডের মত হইয়া থাকিতে হইবে। তাহারা আমাদের যখন যেভাবে উপমর্দ্দন করিবে, বা যে ছাঁচে ঢালিবে সেই ছাঁচেই, সেইভাবেই তখন আমরা গঠিত ও ভাবিত হইয়া উঠিব। আরও এক কথা। ঘরের মধ্যে কোন স্থানে স্থিত যদি একটি শক্ত বর্ত্তুলকে আমরা সকলে চারিদিক হইতে আনাড়ীর

ন্যায় উপর্য্যুপরি লগুড়াঘাত করিতে থাকি, তাহা হইলে হয় বর্ত্তুলটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে, নচেৎ অচলের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া ঘরের বাহিরে পড়িয়া সংসারে আপনার ব্যক্তিত্ব বিশেষত্ব হারাইতে বসিবে। কুম্ভকর্ণের মহানিদ্রা ভঙ্গের জন্য তাহাকে ন্যায়-অন্যায় রূপে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া তাহার অচলায়তনকে সচল করিয়া তুলিলেও তুলিতে পার বটে, কিন্তু তাহার জাগরণের পর যদি তাহাকে আপন পাঁজিপুঁথি খুলিয়া তাহার অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব-নিকাশ মিল করিয়া লইবার অবসর না দাও, তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী গন্তব্য পথ তাহাকে নির্ণয় করিবার অবসর না দাও, তাহা হইলে অচলতার বন্ধন ছিন্ন করিলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

তারপর Romantic Movement সর্ব্বথা প্রযোজ্য নয়। যে দেশের অতীতকাহিনী নাই, যাহাদের কোন পৈতৃক সম্পত্তি নাই, যাহাদের বর্ণ-গোত্র-প্রবর নাই, যাঁহাদের দশবিধ সংস্কার নাই, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির কোন সামঞ্জস্য নাই, সর্ব্ব-সাধারণ কর্ত্তৃক প্রমাণ-স্বরূপে গৃহীত ধর্ম্মের একটা ভিত্তি যাহাদের নাই; মোট কথায় যাহাদের Tradition নাই, কেবল মাত্র আছে Convention, তাহাদের সমাজেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে Romantic Movement-এর লীলা খেলা হইতে পারে, — অন্যত্র নহে। তুমি যে পথের পথিক হও না কেন, তুমি হিন্দু, তোমাকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। যে সমৃহমতাবলী বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ বা আত্মপ্রসার করিতে পারেন নাই। উন্নতিবিধান করিতে গিয়া, যদি সমাজের বাহিরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তবে উন্নতিবিধান কোথায় রহিল। পাণ্ডিত্যাভিমানী কেহ হয় ত বলিবেন, বেদের প্রামাণ্য কেন স্বীকার করিব? আমি বলি, তুমি না হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার নাই করিলে, কিন্তু একজনের বাক্য ত প্রমাণস্বরূপে তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে? নচেৎ তোমার বিচার-বুদ্ধি অচলায়তনের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে; কারণ, যুক্তি বিচার, পরিণামে আপ্তপুরুষের বাক্যের উপর নির্ভর করে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও একথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন যে, 'Reason ultimately rests on authority or verbal testimony'। তুমি Helmholtz, Tyndal প্রমুখ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণকে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিবে, আমি না হয় সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, ঋষিগণের বাক্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমার মনে হয় পূজ্যপাদ রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সমাজবিশেষ যদি আজ তাহাদের বিধি ব্যবস্থা বেদ-বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে আজ বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে, কোণ-ঠাসা অবস্থান করিতে হইত না। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ না করিয়া, বৈদিক সমাজ অগ্রাহ্য করিয়া Hamilton, Cousin, Hegel আদি উদ্ভাবিত প্রচারিত যুক্তিদর্শনের উপর তাঁহাদের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রোক্তসমাজের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ ভাল কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সমবেত সুধীবর্গই এ কথার যাথার্থ্য বিচার করিবেন।

সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ঋষি-ব্যাখ্যাত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সঙ্গীতসম্পত্তির হিসাব পুঁজিপাতা খুলিয়া মিল করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। সুতরাং অতঃপর দেখা যাউক, সঙ্গীত বলিতে ঋষিরা কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং তাহা কিং স্বরূপ?

'সঙ্গীত'-শব্দে ঋষিরা গীত-বাদ্য-নৃত্য এই ত্রিতয়কেই বুঝাইয়াছেন। 'গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ

সঙ্গীতমুচ্যতে'। গীত, বাদ্য ও নৃত্য, এই ত্রিতয়ের সাধারণ গুণ — লোকানুরঞ্জন। যাহা এই সাধারণ গুণ বিবর্জ্জিত তাহা সঙ্গীত নামাভিধেয় হইতে পারেনা।

মার্গ ও দেশী ভেদে, এই সঙ্গীত দ্বিবিধ। আমাদেশে এই দ্বিবিধ সঙ্গীত স্মরণাতীত কাল হইতে প্রকাশ পাইয়াছে।

যে সঙ্গীতকলা ভরতমুনি স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করতঃ দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বদুঃখোপশমকারী মুক্তি প্রদায়িনী সঙ্গীতই 'মার্গ' নামে অভিহিত এবং দেশে দেশে বা দেশান্তরক্রমে যে সঙ্গীত তত্তৎ দেশীয় রীতিনীতি অনুসারে লোকরঞ্জনার্থ সাধিত হইয়া থাকে তাহাই 'দেশী' পদবাচ্য।

যাহা হউক, যে শাস্ত্র পাঠে, গীত, বাদ্য, নৃত্য সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ভোগ ও অপবর্গের পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই সঙ্গীতশাস্ত্র বলে। হিন্দুদিগের এই সঙ্গীতশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। যথা—১। গীতাধ্যায়, ২। বাদ্যাধ্যায়, ৩। নৃত্যাধ্যায়। এই তিনটির একত্র সমাবেশকে শাস্ত্র, "তৌর্য্যত্রিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে, এই তৌর্য্যত্রিক নাদাত্মক, — 'নাদ হইয়াছে আত্মা যাহার, নাদই ইহাদের আত্মা বা প্রকৃত স্বরূপ।

হিন্দুমতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য, তিনটিই নাদাত্মক, নাদ ইহাদের প্রকৃতি, নাদ হইতেই ইহারা উৎপন্ন, নাদেতেই ইহারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নাদেই ইহারা বিলীন হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অতএব দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইবে, —নাদ-ই এই তৌর্য্যত্রিকের ব্রহ্ম।'

গীতাদি তৌর্য্যত্রিক যে নাদের অধীন, যে নাদকে অবলম্বন করিয়া তৌর্য্যত্রিক আমাদের ভোগ ও মুক্তির বিধান করে সেই নাদ কিং স্বরূপ?

নাদ অর্থে বাক্ বা শব্দ। বাক্ বা শব্দ নাদেরই পর্য্যায় মাত্র। শব্দ কোন পদার্থ? "গৌঃ" — এস্থলে শব্দ কোনটি?

যাহা গলকম্বল লাঙ্গুল ককুদখুর ও শৃঙ্গবিশিষ্ট তাহাই কি শব্দ? না — তাহাকে দ্রব্য বলে। তবে যাহা তাহার ইঙ্গিত, নিমেষ, চেষ্টা প্রভৃতি তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে ক্রিয়া বলে। তবে, যাহা শুক্ল নীল কপিল কপোত প্রকৃতি বর্ণ তাহা কি শব্দ? না; তাহাকে গুণ কহে। তবে যাহা ভিন্ন বস্তুতে অভিন্ন থাকে, বস্তু ছিন্ন হইলেও যাহা ছিন্ন হয় না এবং সামান্যভূত, অর্থাৎ জাতির ন্যায়, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে আকৃতি কহে।

তবে শব্দ কোনটি? যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল ককুদ শৃঙ্গ ক্ষুর বিশিষ্টের জ্ঞান হয় তাহাকে শব্দ কহে। অথবা যে ধ্বনির দ্বারা জগতে পদার্থের প্রতীতি জন্মে সেই ধ্বনিকে শব্দ কহে। বাক্, শব্দ, ধ্বনি বা নাদ ইহারা পরস্পর পরস্পরের সমান অর্থবাচী পর্য্যায় মাত্র।

পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী কেহ কেহ হয়ত এতচ্ছ্রবণে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ সাময়িক, সাঙ্কেতিক Conventional না হইয়া, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, পৃথিবীর গুরুত্বের ন্যায়, তাহা যদি নিত্য হয়, তবে শব্দ নাদিত, উচ্চারিত হইলে সকলেরই হৃদয়ে তাহার জ্ঞান হয় না কেন? দাহিকা শক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, তাহার সহিত শিশু সংস্রবে আসিবামাত্র অন্যের অপেক্ষা ব্যতিরেকে তাহা শিশুকে দগ্ধ করিতে থাকিবে।

'এই শব্দের এই অর্থ' গুরুমুখে ইহা শ্রবণ করিবার পর তবে তৎশব্দের অর্থবোধ হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দার্থগত যে সম্বন্ধ তাহা যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে বিনা উপদেশে শব্দের অর্থ প্রতীতি হইত। সুতরাং ইহার এই অর্থ, পুরুষবিশেষের দ্বারা এইরূপ কথিত হইলে পর, যখন শব্দের অর্থ বোধ হয় তখন শব্দার্থগত সম্বন্ধকে পৌরুষেয় বলাই সঙ্গত।

কিন্তু, না; তাহা সঙ্গত নহে। অগ্নি শব্দ, দাহিকা শক্তি তাহার অর্থ। পৃথিবী শব্দ, গুরুত্ব তাহার অর্থ। অগ্নিকে মানুষ দাহকতাবিশিষ্ট করে নাই, পৃথিবীকেও মানুষ গুরুত্ব প্রদান করে নাই। দাহকতা যদি অগ্নির ধর্ম্ম হয়, তবে শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের বাচ্য-বাচক, প্রকাশ্য-প্রকাশকের সম্বন্ধও নিত্য মানিতে হইবে। অগ্নি দগ্ধ করে সত্য; কিন্তু মধ্যে অন্তরায় থাকিলে অগ্নি কি দগ্ধ করিতে পারে? মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ধর্ম্ম। কিন্তু আমি শক্তিবিশেষের আশ্রয় পাইলে কি তাহা আমাকে ধরাতলশায়ী করিতে পারে? শাস্ত্র বলিয়াছেন, শব্দ যথাযথভাবে অন্তরায়বিহীন হইয়া উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা আমরা সত্যের রূপ দর্শন করিয়া থাকি মাত্র। আমরা সত্যের সৃষ্টি বা জন্মদান করিতে পারি না। যাহা সত্য তাহাকে আমরা যে জানিতে পারি না, সত্বাদি গুণত্রয়াত্মক ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কার দোষাদি অন্তরায় কর্ম্মই তাহার প্রতিবন্ধক। দোষাদি বিবর্জ্জিত অন্তরায় শূন্য হইয়া শিশু মুখরিত অগ্নি শব্দ, তদ্দণ্ডেই যে স্ব-রূপে প্রকটিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'এই শব্দের এই অর্থ', ইহা সম্বন্ধ-করণ নহে; পার্থসারথি বলিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের কথন মাত্র। কিরূপে তাহার নির্ণয় হইবে? যে শব্দের যাহা অর্থ, যদি কেহ তদ্ শব্দে তদর্থ না করিয়া স্বতন্ত্র অর্থ করে, তবে বহু ব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করিয়া থাকে। অদ্যকার সভাই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিলেও করা যাইতে পারে। 'গো' শব্দে যদি কোন ধীমান 'অশ্ব' বা 'গবয়' অর্থ করেন, তাহা হইলে অনেকেই সেই অর্থমর্ম্ম গ্রহণকারীকে 'অশ্ব বা গবয়', গো শব্দের অর্থ নয়', এইরূপে নিষেধ করিবেন। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কাল্পনিক বা পুরুষকৃত হইলে, লোকে এইরূপ নিষেধ করিত না। শব্দের প্রকাশকত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে প্রথম শ্রবণেই যে উহার অর্থের প্রতীতি হইত এবম্বিধ আশঙ্কা চিন্তাশীলের নিকট উঠিতে পারে না। শব্দের স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব অবগত হইলে, তবেই উহা অর্থ প্রতিপত্তির নিমিত্ত হয়; স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব প্রতিপন্ন বা অবগতি না হইলে, ব্যবহার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রথম শ্রবণে অর্থের প্রতীতি না হওয়াই স্বাভাবিক'।

যে শব্দের সহিত অর্থের এই নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই নাদ, বাক্ বা শব্দ হইতেই দেবতাদি নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদান্ত "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (১৩।২৮) এই সূত্রের দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মীমাংসা ব্যাকরণ প্রভৃতি এই শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন, "অতএব চ নিত্যত্বম্" (১৩।২৯)। এইজন্যই ভর্ত্তৃহরি, শব্দকেই পরমাণু, শব্দকেই ইন্দ্রিয়, এবং শব্দকেই চিৎশক্তি বলিয়াছেন। সকল পদার্থই সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে। বিশ্বনিবন্ধিনী শব্দাশ্রিতা। অধিষ্ঠানের পরিণামবশতঃ আত্মাভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া, অর্থ সকল বাচ্যবাচক-ভাবরূপ ভেদাত্মাতে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাবলী শব্দ-মূলক। শব্দ ব্যতিরেকে দর্শন ও সন্দর্শন বা পরীক্ষা হয় না। পুরুষ যে তর্ক করে তাহা

শব্দের প্রসাদে। শব্দাশ্রিত শক্তিই পুরুষাশ্রয় তর্ক। তর্ক শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। বিদ্যা, শিল্প ও কলাকৌশল দ্বারা লৌকিক ও বৈদিক অর্থে মনুষ্যগণের প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে। সেই বিদ্যাদি আবার বাক্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ। সমানাকার অভিনিষ্পন্ন বস্তুসমূহের বিবিধ পরিচ্ছেদেও বাক্-কৃত। প্রথমোৎপন্ন বালকের ইন্দ্রিয় বিন্যাসাদি শারীরযন্ত্র সকলের যথাযোগ্য ক্রিয়া নিষ্পাদন শব্দ হইতে হইয়া থাকে। অতএব যে নিত্য শব্দের উপর প্রত্যক্ষাদি পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত, যে শব্দ বাক্‌ব্যবহারাদি কলাকৌশলের উপাদানভূত, সেই শব্দাখ্য, নাদই ঋষ্যুপদিষ্ট তৌর্য্যত্রিকের আত্মা বা ব্রহ্ম। এই জন্য শাস্ত্র সঙ্গীত-বিদ্যাকে নাদবিদ্যা বলিয়াছেন। শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, সততোত্থিত — পতিত উত্তালতরঙ্গ-মালা বিক্ষোভিত নাদাখ্য এই মহাসমুদ্র অপার অসীম। অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বীচিবিক্ষুব্ধ এই দুর্নিরূপণীয় মহাসমুদ্রের সীমা নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। শ্বেত-বরণী ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী বাঙ্ময়ীদেবী সরস্বতী, এই জন্য স্বভাবত সঞ্চরণ-কলাকুশলী স্ববাহন পরমহংসারূঢ় হইয়া, নিত্য তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নাদরূপ মহাসমুদ্রে অদ্যাপি বিচরণ করিতেছেন। পবনবিতাড়িত উত্তাল তরঙ্গমালার নৃত্য বৈচিত্র্যে বিভোরত্ব নিবন্ধন আপনি তাল-মান রাখিতে না পারিয়া পাছে সহসা তৎসঙ্গে সাগরের অতলস্পর্শী মহাগর্ভে তাঁহাকে সমাধি লাভ করিতে হয়, এই জন্য সমুদ্র নিমজ্জনভয়-মঞ্চস্বরূপ মেরুদণ্ডের উভয় প্রান্ত-সংলগ্ন তূম্বদ্বয় শোভিত, বিবিধ মূর্চ্ছনাতানাশ্রয়ীভূত বিচিত্র বীণাযন্ত্র, হৃদয়ের বিচিত্র তাল বিকম্পিত পীনোন্নত পয়োধর শোভিত সুকুমার বক্ষোপরি আপন কোমল করপল্লবে ধারণ করিয়া, তাঁর কর্ম্মশীলতার মধ্যে আপনি অনন্ত সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে 'সাধকানাং হিতার্থায়' অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন।

যাহা হউক, মায়াশবল ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বোপাদানভূত অনাদিনিধন এই নাদই আবার অনাহতাহত ভেদে দ্বিবিধ। "যদ্বাহাম্ তদন্তরং", এতন্নিবন্ধন, এই দ্বিবিধ নাদ-ই আমাদের পিণ্ডদেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন এই নাদ পিণ্ডদেহে প্রকটিত হয়, তখন উহা পিণ্ডনাদাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেহে প্রকটিত এই অনাহত নাদটি পরা, নির্গুণ পরমব্রহ্ম স্বরূপ। ইহা অরূপী, অতীন্দ্রিয় এবং রাগবিরাগশূন্য-হৃদয় একান্তনিষ্ঠ কবির — ক্রান্তদর্শী যোগীর ধ্যানের বিষয়। ইহা বিবিধবৈচিত্র্যবিমুগ্ধ মাদৃশ প্রাকৃতজনদিগের ধ্যানের বিষয়ীভূত নহে। সদ্‌গুরূপদিষ্ট হইয়া ইহার স্বরূপ ধ্যানমাত্রই মোক্ষলাভ নিবন্ধন, ইহা সাংসারিকের ভোগের অনুকূলও নহে।

কিন্তু অস্মদ্দেহে প্রকটিত আহত নাদটি সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ। জৈবদেহে ইনি প্রাণস্বরূপ সূত্রাত্মা। ইহা প্রাকৃতজনের ধ্যানের বিষয় এবং ইহারই সাধনা, উপাসনা হইতে জীবের ভোগ ও মুক্তি, উভয়ই সংসাধিত হইয়া থাকে। আহত কি না, শ্রুত্যাদি উপায় দ্বারা অর্থাৎ স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা তানাদি দ্বারা সাধিত উদগীত হইয়া যে নাদ, পিণ্ডদেহ হইতে বাহিরে আসিয়া জনসাধারণের নিকট ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বৈখরীরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করে, সংসারের জরাজন্মমরণাদি ক্লেশ নাশ করে, সগুণব্রহ্ম স্বরূপ তাহাই আহত নাদ।

সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ আহত নাদোপাসনা হইতে, লোকে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়া থাকে। উপাসনা সাধনারই নামান্তর। উপাসনা সগুণব্রহ্মবিষয়ক মনের ব্যাপার মাত্র। সুতরাং

বুঝিতে হইবে, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও আহতনাদ সাধনা উভয় একই কথা। শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, শ্রুতি মূর্চ্ছনাদি উপায়ে সাধিত, নানাছন্দে উপহত, উদগীত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বৈখরী বাক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া এই নাদই লোকে ভবভয়হারী ভুবনমনোরঞ্জনকারী অলৌকিক গীতপদবাচ্য হইয়া থাকে। এবম্বিধ ছন্দবদ্ধ গীত-পদবাচ্য এই আহত নাদই, সাধকের ও শ্রোতৃবর্গের প্রথম ভোগবাসনা পরিতৃপ্তি করিয়া, পরিণামে তাহাদের অশেষবিধ কল্যাণ ও কৈবল্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। গীত পদার্থের ইহাই সাধারণ স্বরূপ। আরও শব্দ বুঝাইতেছেন নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর, স্বর হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে রাগ, রাগ হইতে গীত, গীত হইতে সঙ্গীত এবং সঙ্গীত হইতে বর্ণপদবাক্যাদি শোভিত বৈখরী বাগ্ব্যবহারের আবির্ভাব হইয়াছে।

সঙ্গীত (Music) হইতে ভাষার যে সৃষ্টি হইয়াছে, একথা প্রতীচ্য সুধীগণও স্বীকার করেন। ভাষা মনোগত ভাবপ্রকাশোপায় স্বরূপ পদাবলীর বিচিত্র সমাবেশ। বাক্য কোন বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক বিচিত্র পদবিন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'পদ' বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। বর্ণ কোথা হইতে সমুদ্ভূত? —"প্রযোক্তুরীহা গুণসন্নিপাতে বর্ণা ভবনগুণবিশেষযোগাৎ", — অর্থাৎ প্রযোক্তার ঈহা, চেষ্টা বা প্রযত্ন হইতে গুণসন্নিপাতে, গুণবিশেষ যোগবশতঃ বিভিন্ন বর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। পিঙ্গলাচার্য্য বুঝাইয়াছেন, আত্মা বুদ্ধিদ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয় পূর্ব্বক, মনকে তাহা বলিবার জন্য, প্রকটিত করিবার জন্য, প্রেরণ করেন; মন কায়ান্তর্বর্ত্তী অগ্নিকে, এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করেন। বায়ু এইরূপে প্রেরিত হইয়া উদীর্ণ, উর্দ্ধগত ও মূর্দ্ধদেশে অভিহত হইয়া মুখ-বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক, স্বর, কাল, প্রযত্ন, স্থান ও অনুপ্রদান, ইহাদের ভেদানুসারে ক-খ-গ ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বর বা শব্দই সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি। স্বরই বর্ণমাত্রের মূল কারণ। কারণের রূপভেদে কার্য্যের রূপভেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব বর্ণের যে রূপগত ভেদ, তৎপ্রকৃতিভূত স্বরের বা শব্দের রূপভেদই তাহার কারণ। — "তস্য রূপান্যত্বে বর্ণান্যত্বম।"

আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে নাড়ীর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান আছে। অসংখ্যনাড়ী সকলমধ্যে নাদসাধনোপায়স্বরূপ সুষুম্না, ঈড়া ও পিঙ্গলাদিভেদে দ্বাবিংশ মুখ্য নাড়ীর ক্রিয়াদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং এতন্মধ্যে আবার সুষুম্না, ঈড়া, পিঙ্গলা এই তিনটিকেই নাদ সাধনে মুখ্যতম উপায়স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র তথা যোগশাস্ত্র বলেন, এবং প্রতীচ্য নরদেহতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাও অবগত আছেন যে, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত ষড়বিংশ কশেরুকাস্থিগঠিত পৃষ্ঠ বংশ-গর্ভস্থ মজ্জার ঠিক মধ্যস্থান ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মস্তিষ্কাধিপতি সহস্রার হইতে পৃষ্ঠবংশের অধঃস্তন দেশে স্থিত মূলাধারাখ্য চক্র ত্রিকাস্থি সন্মুখীন গ্রন্থি অবধি বিস্তৃত সূক্ষ্ম ঈষৎ শ্বেতাভ সূত্র সদৃশ একটি নালি আছে। ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্র কথিত সুষুম্না নাড়ী। মাদৃশ প্রাকৃত জনসাধারণের উক্ত নাড়ীর মূলাধারাভিমুখীন মুখটি বন্ধ থাকে এবং সাধনার ক্রিয়া বিশেষে তাহা উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই পৃষ্ঠবংশের বামে ও দক্ষিণে, কশেরুকামাজ্জের সূক্ষ্ম সূত্রদ্বয় উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত কশেরুকাস্থিনিচয় গ্রথিত করিয়া মস্তিষ্কাধিপতি সহস্রার হইতে নিম্নে মূলাধারাখ্য ত্রিকাস্থিতে সম্মিলিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, ঈড়া-পিঙ্গলা অগ্নিসোমাত্মক, ধন-ঋণ (Positive and

Negative)-ধর্ম্মাত্মক। সুষুম্না কিন্তু অগ্নি, সোম ও বায়ু, এই ত্রিতয়াত্মক।

জীবদেহে সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের মধ্যে দ্বিবিধ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গতিবিধায়ক, অপরটি সংজ্ঞাবিধায়ক। ঈড়া-পিঙ্গলাখ্য স্নায়ুদ্বয় এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার প্রভবক। উক্ত দ্বিবিধ নাড়ীতে প্রোক্ত দ্বিবিধ শক্তি-প্রবাহ চলাচল করিয়া থাকে। শাস্ত্র এইজন্য বলিয়াছেন, "ঈড়া-পিঙ্গলামধ্যে দ্যৌমৎস্যৌ চলিতৌ সদা।" প্রথমোক্ত ক্রিয়ার ফল 'গতি', দ্বিতীয় ক্রিয়ার ফল 'অবগতি'। 'অবগতি' ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজনিত আঘাতের প্রতিঘাত-রূপ তরঙ্গ মাত্র। আশঙ্কা হইতে পারে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজনিত আঘাতের প্রতিঘাতরূপ তরঙ্গই যদি অবগতির স্বরূপ হয়, তাহা হইলে স্বপ্নজাত অবগতির বিচিত্র ব্যাপারের মীমাংসা কি হইবে? কারণ, তখন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজনিত আঘাত নাই, অথচ অবগতি হইতে দেখা যায়। এই আশঙ্কা হইতেই প্রতীত হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজাত যাবতীয় সংস্কাররাশি শরীরের কোন না কোন স্থানে সঞ্চিত আছে। এই সংস্কার রাশিই শরীরাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্বপ্নপ্রভবক মৃদু তরঙ্গ উৎপন্ন করে। যে কেন্দ্রে এই সংস্কারনিচয় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেই কেন্দ্রস্থানই মূলাধার চক্র, যদাধারে দেহের উর্জ্জবীর্য্য স্বরূপ যাবতীয় ক্রিয়াশক্তি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এই পরাশক্তির কুণ্ডলিনী নাম হইবার কারণ এই যে অন্তর্জগতীয় যাবতীয় ক্রিয়ার শক্তি এই স্থানে কুণ্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত আছে। কারণ, বহুক্ষণ চিন্তা ও আলোচনা করিলে মূলাধার চক্র উষ্ণ হইয়া উঠে। এই কুণ্ডলিনী সাধারণতঃ সুপ্তাবস্থায় (Potential) থাকে, জাগ্রত বা উদীয়মানাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঊর্দ্ধগামিনী হয়। ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সুষুম্নার দ্বার উদঘাটিত করিয়া এই শক্তিকে চক্র হইতে চক্রান্তরে উত্থিত করিলে সমগ্র শরীরে তীব্রক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়। যখন এই শক্তি সুষুম্নার মধ্যে কিয়দ্দূরে উঠিয়া থাকে, তখন কল্পনার বিকাশ হয়। কিন্তু যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া উর্জ্জবীর্য্য স্বরূপ এই কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্নাপথেই-চলাচল করে, তখন যে প্রতিক্রিয়া সমুৎপন্ন হয় তাহা হইতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিকাশ হয়। কিন্তু যখন যথোক্ত শক্তি সর্ব্বানুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কাভ্যন্তরে স্ফুরিত হইতে থাকে, তখন সমুদয় মস্তিষ্ক এবং উহার অনুভব সম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু স্পন্দিত হইতে থাকে। আত্মানুভূতির ইহাই অব্যবহিত পূর্ব্ববিস্থা। যোগীগণ এই কথারই উপদেশ দিয়া থাকেন। অনেকেই বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম শ্বাসোচ্ছ্বাসের কোন ক্রিয়াবিশেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়াদির সহিত ইহার সম্বন্ধ অতীব অল্প। প্রাণায়ামের অর্থ হইতেছে, সিদ্ধিসাধন উদ্দেশ্যে প্রাণের সংযমন ও নিয়মন। দেহাভ্যন্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সঞ্চারিত প্রাণদি শক্তিকে সংযত করিয়া সুষুম্না পথে নিয়মিত করাই প্রাণায়াম সাধন। প্রাণের সংযমন-নিয়মন হইতেই সুষুম্নার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। মূলাধারাভিমুখী সুষুম্নাদ্বার উদঘাটনের বিবিধ উপায় আছে। তন্মধ্যে সঙ্গীত একটি সহজ উপায় মাত্র। সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, যথাবিহিত উপায়ে নাদ-সাধন করিলে, প্রোক্তদ্বার সত্বরই উদঘাটিত হইয়া থাকে। সুষুম্নার দ্বার উদঘাটিত হইলে, মূলাধারে কুণ্ডলীকৃত সুপ্তাত্মা স্বরূপ উর্জ্জবীর্যারাশি, সুষুম্না পথ বাহিত করিয়া স্বাধিষ্ঠান প্রমুখ চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রাখ্য চক্রে আরোহণাবরোহণ করিয়া থাকে। যেমন রজ্জু-নর্ত্তকী রজ্জু সাহায্যে ঊর্দ্ধোত্থিত আধারে উত্থিত হইয়া যথাভিলষিত নৃত্যাদি তথায় সম্পন্ন করিয়া

পুনরায় রজ্জু অবলম্বনে অবতরণ করে, সেইরূপ নাদাখ্য সূত্রাত্মাজীবও সুষুম্না সাহায্যে ঊর্দ্ধস্থিত অমৃতাধার ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ করিয়া তথায় যথাভিলষিত গীতাদি কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় সুষুম্নাপথবলম্বন করিয়াই মূলাধারে অবতরণ করিয়া থাকে।

ঊর্জ্জবীর্য্য স্বরূপিনী কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন ও ঊর্দ্ধগমন সম্বন্ধে সঙ্গীত শাস্ত্রে বলিয়াছেন, আত্ম-বুদ্ধি দ্বারা প্রয়োজন নিশ্চয় করিয়া, চিত্তকে তাহা প্রকটিত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। চিত্ত কায়ান্তবর্ত্তী উদরস্থিত বহ্নিকে, বহ্নি মূলাধারাশ্রিতা ঊর্জ্জবীর্য্য স্বরূপিণী মূলাশক্তি প্রাণবায়ুকে প্রেরণ করেন। ধনঋণ ধর্ম্মাত্মক শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ান্যায়ে বিধ্বস্ত প্রপীড়িত হইয়া মুখাপ্রাণবায়ু সুষুম্নাপথে তালে তালে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধোত্থিত হইতে থাকে। মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া আঘাত জনিত বেগ নিবন্ধন স্বাধিষ্ঠান চক্র অতিক্রম করিয়া যখন নাভিমূলদেশে মণিপুরক চক্রের নিম্ন অবধি চলাচল করিতে থাকে, তখন শক্তিরূপত্ব বশতঃ অতীব সূক্ষ্মধ্বনিরূপে অবস্থান নিবন্ধন, ইহাকে 'পরা' এতদ্‌সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। মণিপুর হইতে আবার ঘাতপ্রতিঘাতে তালেতালে উত্থিত হইয়া যখন অনাহত চক্রের নিম্নদেশে ইহা সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন ইহা মাদৃশ প্রাকৃতজন কর্ত্তৃক দুর্নিরূপণীয় হইলেও, যোগীগণের অনুভূয়মানত্বনিবন্ধন "পশ্যন্তী", এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। অনাহত-চক্রোত্থিত হইয়া যখন হৃদয়ে বিশুদ্ধাখ্য চক্রে ভ্রমণ করে তখন ইহার অপেক্ষাকৃত পুষ্টিত্ব নিবন্ধন 'মধ্যমা', এই নামে পরিচিত হইয়া থাকে। তদনন্তর কণ্ঠকূপে বিশুদ্ধচক্রে ষড়জাদি স্বর-স্বপ্তকে স্বস্বভেদানুসারে সম্যক প্রকট নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপে বিবর্ত্তন হেতু 'বৈখরী', এতদাখ্যায় অভিহিতা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বর, কাল, শ্বাস, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান, এই পাঁচটি তান মূর্চ্ছনাদিবৈচিত্র্যের হেতু।

সঙ্গীত শাস্ত্র বলিয়াছেন, উদারা-মুদারা-তারা ভেদে স্বর ত্রিবিধ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, ভেদে, বেদান্ত যথাক্রমে তারাদিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। উদাত্তাদিস্বর সম্বন্ধে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, আয়াম অর্থাৎ গাত্রের দৈর্ঘ্য, দারুণ অর্থাৎ স্বরের কঠিনতা, অনতা — গলবিবরের সংবৃততা, ইহারা স্বরের উদাত্ত হেতু। অন্ববসর্গ অর্থাৎ গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দ্দব অর্থাৎ স্বরের স্নিগ্ধতা, গলবিবরের উরুতা অর্থাৎ স্থূলতা, ইহারা শব্দের অনুদাত্ত-হেতু। সঙ্গীত শাস্ত্র বলিয়াছেন, নাভিমূল হইতে হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী পথে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ-বিকারজনিত ধ্বনিই উদারা। হৃদিস্থিত অনাহত চক্র হইতে বিশুদ্ধাখ্য চক্রের মধ্যবর্ত্তী পথে সঞ্চারিত বায়ুবিকারজনিত ধ্বনিকে মন্দ্রানামে পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে, এবং বিশুদ্ধাখ্যচক্রোত্থিত হইয়া মূর্দ্ধাভিঘাতহেতু বায়ুবিকার জনিত ধ্বনিই 'তারা' নামে অভিহিত হয়। ধ্বনির এই যে বিবরণ, ইহা স্বরের উপাদানভূত প্রাণবায়ুরই বিপরিণাম। স্বরের হ্রস্বদীর্ঘাদিরূপে যে বিবর্ত্তন তাহা কালকৃত পরিণাম। তালুওষ্ঠাদি বক্ত্রে যে বিপরিণাম তাহা দেশত বিবর্ত্তন। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে প্রযত্নদ্বৈবিধ্যের মধ্যে যাহা পৃষ্ট, ঈষৎপৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত ইহারা অভ্যন্তর প্রযত্ন; এবং বিবার, সংবার, শ্বাস, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, ইহারা বাহ্য প্রযত্ন। "অনুপ্রদান" শব্দে পশ্চাৎ-প্রদান বুঝিতে হইবে। স্বস্বস্থান হইতে উচ্চারণ ভেদে যে অন্যস্থানে প্রদত্ত হয়, তাহাকে অনুপ্রদান কহে। মূর্চ্ছনাদি-তানগমক ব্যাপারে ইহার

লীলাবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তীরীয় প্রাতিশাখ্য বলিয়াছেন, অনুপ্রদান, সংসর্গ, স্থান, করণবিন্যয় বা বিন্যাস, পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রাকালভেদ নিবন্ধন স্বরবর্ণশব্দাদির বিবিধ বৈচিত্র্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, আহত-নাদ সাধন হইতেই স্বরগ্রামের ঘটকাবয়ব সংযোজক-তন্ত্ররূপ 'শ্রুতি' পদার্থের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। শাস্ত্রে বুঝাইয়াছেন, দেহাভ্যন্তরস্থ বিবিধ স্নায়ুজালসংলগ্ন দ্বাবিংশপ্রকার সমবেদক মুখ্যস্নায়ুর প্রকম্পন হইতে দ্বাবিংশ শ্রুতির বৈখরী বিকাশ হইয়াছে। ষড়জাদি স্বরসপ্তকের ব্যাখ্যা ও পরস্পর আত্মনিষ্ঠ ভেদরহস্য, এই দ্বাবিংশ শ্রুতি মধ্যেই নিহিত আছে। ইহাদেরই জাতি ও সংখ্যাগত পরস্পর ইতরবিশেষে মিলন নিবন্ধন স্বরসপ্তকের বৈচিত্র্য সংঘটিত হইয়া থাকে। ষড়জঋষভাদি শ্রুতিভেদজাত স্তরবিন্যস্ত স্বর-সপ্তকের সাতটি নাম মাত্র। যে স্বরাদিদ্বারা ষড়জাদি পদার্থ সপ্তকের জ্ঞান হয়, শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, তাহারা ব্যাকরণোপদিষ্ট বর্ণমালার অ-আ-ই-উ-এ-ও-ঔ রূপে প্রসিদ্ধ সাতটি স্বরবর্ণ; উচ্চাবচ উচ্চারণ-ভেদ নিবন্ধন ঐ স্বর-সপ্তকই উদারাদি গ্রামত্রিতয়ে বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। ষড়জ-গ্রাম অ-গ্রামের বাচী; গান্ধার গ্রাম ই-গ্রামের পর্য্যায়ান্তর; এবং মধ্যমগ্রাম ও উ-গ্রাম, ইহারা সমানার্থক। প্রযত্ন অনুপ্রদানাদি নিমিত্তকারণসহায়সঞ্জাত, গ্রামত্রিতয়ে প্রবিভক্ত আরোহণাবরোহণাত্মক একবিংশ মূর্চ্ছনাকেই, ব্যাকরণোপদিষ্ট অ হইতেই ঔ-পর্য্যন্ত, এই চতুর্দ্দশবিধ স্বর এবং ক-চ-ট-ত-প-য-শ, এই ব্যঞ্জনবর্গ-সপ্তকের বিকাশের মূলীভূত হেতুরূপে আমরা পাইয়া থাকি। ব্যাকরণোপদিষ্ট, অনুস্বার বিসর্গ লইয়া অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত ষোলটি স্বরবর্ণ এবং ক-চ-ট-ত-পাদি বর্গসপ্তকে বিভক্ত ত্রয়োত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ; একুনে বর্ণমালার এই উনপঞ্চাশদ্‌বর্ণ, সঙ্গীত শাস্ত্র ব্যাখ্যাত উনপঞ্চাশদ্‌বিধ কূটতান হইতেই ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, স্বরশব্দাদি নিত্য। সুতরাং এতদ্দ্বারা কেবল যে "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" প্রতিপাদিত হইল তাহা নহে, শাস্ত্রমতে রাগরাগিণীমূর্ত্তি যে নিত্য এবং সঙ্গীত হইতে যে যাবতীয় বৈখরীবাক্-ব্যবহার সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও সূচিত, সিদ্ধ ও প্রতিপন্ন হইল।

অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান, স্বীয় অভিব্যক্তির নিমিত্ত স্বরাদিরূপে ছন্দোবন্ধে বিবর্ত্তিত হয়েন। এই জ্ঞানাত্মক শব্দ মনোভাব প্রাপ্যন্তর তেজ দ্বারা পরিপক্ক হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল স্বরাদি ধাতুসম্ভূত বৈখরীবাগ্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। অভিব্যক্তি ক্রমবিকাশ শব্দেরই পর্য্যায় মাত্র। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের বিকাশ উত্তরোত্তরভাবেই ক্রম-নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রম কিন্তু কালের ধর্ম্ম। সুতরাং অভিব্যক্তি মাত্রেই কালাধীন। অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মকভেদে, কাল দ্বিবিধ। অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাকাল অরূপী ও অতীন্দ্রিয়। সংসারে ইহার ব্যবহার নাই। পরিছন্ন প্রকৃতিতে; পরিদৃশ্যমান সংসারে; জন্মাদিষড়বিধ ভাববিকারে, জ্যোতিষিক সৃষ্টিতে গ্রহাদির স্বকক্ষ পরিভ্রমণে; জৈববদেহে স্নায়বপ্রবাহে; (Lub, dub, pause,) সমাজদেহের উপবেশন, উত্থান, গমনে; শ্রুতিস্বরাদি সম্ভূত বৈখরীবাক্ ব্যবহারে, আমরা সঙ্গীতে হ্রস্বদীর্ঘাদি রূপে অভিব্যক্ত মাত্রার্থক কলনাত্মক কালের সংবাদ পাইয়া থাকি। মাত্রার স্বরূপ নির্ণয় করিবার সময় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "কালেন যাবতা পাণিঃ পর্য্যেতি জানুমণ্ডলে সা মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতে মতা।" তন্ত্রশাস্ত্র

বলিয়াছেন, — ''বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রমণং যাবতা ভবেৎ। কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ।।'' অতএব বুঝিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষা উত্থান-বিরাম বিবক্ষিত হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রাবচ্ছিন্ন স্বরশব্দাদির বিবিধ বিচিত্র-বিন্যাসই ছন্দের স্বরূপ।

বিশ্বজগৎ শব্দেরই এবম্বিধ বিপরিণাম মাত্র। 'শব্দ ছন্দবদ্ধ হইতেই বিশ্ব-সংসারের বিবর্তন, এই উপদেশবাক্যদ্বারা ভগবান ভর্তৃহরি, আপেক্ষিক অস্তিত্ব মাত্রই যে, নিমিত্ত দেশকালাবচ্ছিন্ন বিবিধ ছন্দোনিবদ্ধ অবস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাই বুঝাইয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান,প্রযত্নাদি নিমিত্তকারণ সাহায্যে অবিকৃতবিকৃত ভেদে দ্বাদশ যড়জাদিতে প্রবিভক্ত রেখানুপাতে বিচিত্র-বিন্যস্ত হ্রস্বদীর্ঘাদিমাত্রাবচ্ছিন্ন বিবিধ ছন্দোনিবদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছনাদিতে অভিব্যক্ত জীব-মন-মুগ্ধকর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, যড়জাদি ধাতুগত উপাদান ও কালপরিমাণার্থক হ্রস্বদীর্ঘাদিমাত্রা, প্রযত্নপ্রেরিত অনুপ্রদানাদিকর্ত্তৃক পরিবিন্যস্ত হইয়া বিবিধ মূর্চ্ছনাতানাদিতে অভিব্যক্ত গীতাদি পদার্থ রচিত ও উদগীত হয়। স্বর বা ধাতু ও মাত্রা, এই দুইটি গীতপদার্থের ঘটকাবয়ব বা সমবায়ী কারণ; এবং পুরুষ প্রেরিত প্রযত্নানুপ্রদানাদি, ইহারা নিমিত্ত কারণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, কুম্ভকার যেমন, উপাদানভূত সামান্য এক মৃৎখণ্ড হইতে কাল, প্রযত্ন, দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত কারণ সাহায্যে বিবিধ ছাঁদে অভিব্যক্ত ঘটসরাবাদি যাহা কিছু তাহার বাগাবস্থায় বিবক্ষিত ছিল, তাহারই স্থূলসৃষ্টি করিতে পারে, ঠিক তেমনই, স্বরাদিবিদ্ কালজ্ঞ ব্যক্তি ধাতু ও মাত্রা সমবায়ে এবং প্রযত্ন অনু দানাদি নিমিত্ত সাহায্যে, যখন যে ছন্দে যে রাগে ইচ্ছা, তখন সেই রাগে, সেই ছন্দেই গীতাদি পদার্থের রচনা, ও যথাবিধ রীতিতে তাহার গান করিতে পারেন। বস্তুত, অসাধারণ সৌন্দর্য্যগ্রাহী কবির সূক্ষ্ম বাগাবস্থায় স্থিত যে আন্তর উপলব্ধি, তাহাও এই একই রীত্যনুসারে বর্ণগতধাতু ও কালপরিমাণার্থক মাত্রা সমবায়ে, বিচিত্র ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ পরিগ্রহ করতঃ প্রাকৃত জনসাধারণ সমক্ষে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কাব্যে ছন্দের যে কাজ, সঙ্গীতে তালের ঠিক সেই কাজ, ইহা অতি সত্য কথা। কারণ, তাল, স্বরস্থিতির কাল-পরিমাণার্থক মাত্রাসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই জন্যই তাল সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। তালই, সঙ্গীতের ছন্দকে ফুটাইয়া দেখায়। সঙ্গীতে স্বরাদি ধাতু বিন্যাস সমুদ্ভূত পদাদির অন্তরালে অবস্থিত যে অরূপী অনির্ব্বচনীয় ভাব, তাহা ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াই অস্মদ্ সমক্ষে অপরূপ রূপে বিকশিত হইয়া উঠে। এই জন্যই হিন্দুসঙ্গীতে তাল সম্বন্ধে এতাদৃশ আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

''সঙ্গীতের মুক্তি''-শীর্ষক প্রবন্ধে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, ''তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়ে কড়াক্কড়িটা যখন বড় হয়, তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে।''***

'ইয়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাবনিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজের তার সীমানা বাঁধিয়া দেন।''**

প্রতীচ্য সঙ্গীতবিদ্যার সমাচার আমি বেশী রাখিতে পারি নাই। সুতরাং মাঝে মাঝে তাহাতে

বেতালের প্রশ্রয় দেওয়া হয় কি না, তাহা আমি জানি না। তবে এই জানি যে, ''Musical sound means a uniformity in the periodicity of vibration'' । এই uniformity of periodicity-তে ব্যভিচার যদি ইউরোপীয় সঙ্গীতশাস্ত্র প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রতীচ্যসঙ্গীতশাস্ত্রের মূলে সর্ব্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য অতি স্বল্প পরিমাণেই নিহিত আছে। হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের তালাধ্যায়টি কিন্তু বিশ্বব্যাপী কালসম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিখিল লোকব্যবহার এই কালজ্ঞান হইতে জন্ম লাভ করে। কোন্ কালে ইহা করিতে হইবে, এবং কখন ইহা করিতে হইবে না, কালজ্ঞান ব্যতীত তাহার অবধারণ অসম্ভব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ। পর্য্যায়ক্রম হইতে আমাদের এই কালজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ইহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল বিষয়ক। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বন্ধ করিতে না পারিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদয় হয় না। সত্য বাতথ্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক তথ্য (Scientific Truth) প্রাকৃতিক নিয়মসমুদায়েরই পর্য্যায়ান্তর। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? যে অব্যভিচারী নিয়মানুসারে পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জগতে কার্য্য সম্পাদন করেন, আপনাকে প্রকাশ করেন, আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। "Scientific truth is but another name for the laws of nature and a law of nature is merely the uniform mode in which the Diety operates in the created universe." সে যাহা হউক, পরিণামের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাকৃতিক তথ্যসমূহ যখন সঙ্কলিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি সাধনোপায়স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন বিজ্ঞান পুষ্টি লাভ করে। ফলাফল কিন্তু উপাদানভূত ধাতু ও কালপরিমাণার্থক মাত্রাজ্ঞান সাপেক্ষ। মাত্রাসমষ্টিই কলনাত্মক কাল। বর্ত্তমানের সহিত অতীতানাগতের অব্যভিচারী সম্বন্ধ-জ্ঞানই কালজ্ঞান। সুতরাং বুঝিতে হইবে, অতীতের অপেক্ষায় বর্ত্তমানে পরিমাণাত্মক কালের অব্যভিচার ভবিষ্যদ্দর্শনই (quantitative prevision) পরিপুষ্ট বিজ্ঞান (Developed science)। পরিপুষ্ট বিজ্ঞান, কলাবিদ্যারই নামান্তর মাত্র। অরূপীকে রূপমাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, অনির্ব্বচনীয়কে বচন-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার জন্য, কলাবিদ্যার প্রয়োজন ও প্রচার হইয়া থাকে। সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রকলায় আমরা ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। কলা কিন্তু কৌশল ব্যতীত উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। যে উপায়ে কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধ্য হইয়া উঠে তাহাই যোগ, তাহাই কৌশল; ''যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্''। সঙ্গীত শাস্ত্রের তালতত্ত্বে, কাব্যের ছন্দতত্ত্বে, আমরা এই পরিপুষ্ট বিজ্ঞানের সমাচার পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যেমন হ্রস্বদীর্ঘমাত্রা বিন্যাসই ছন্দের স্বরূপ, সঙ্গীতে তালেরও স্বরূপ ঠিক তদ্রূপ। কলনাত্মক কালই তাল। তাল ছন্দেরই পর্য্যায়মাত্র। কাব্যে নিহিত ছন্দের ন্যায় সঙ্গীতে তালেরও যতি আছে। সঙ্গীতে তালের যতিকে 'লয়' বলে। এতদর্থে 'লয়' প্রাদুর্ভাবফলক (প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ফল যাহার); ইহা অত্যন্ত বিনাশ নহে। অতীতের অপেক্ষায় ক্রম-পরিমাণাত্মক ভবিষ্যদ্দর্শনই সঙ্গীতে তালের লয় প্রদর্শন। যেমন মাত্রাসংখ্যা ও যতিগতভেদ নিবন্ধন ছন্দ বিভেদ ঘটিয়া থাকে, সঙ্গীতেও ঠিক তেমনই মাত্রাসংখ্যা ও যতিভেদে তালের

প্রকার ভেদ, সুতরাং নামভেদও হইয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত তালতত্ত্ব পরিপুষ্ট বিজ্ঞান সম্মত। এবং যাহা বিজ্ঞানসম্মত তাহা অব্যভিচারী হইবার কথা। এই জন্যই হিন্দুর কি সঙ্গীততত্ত্বে, কি সমাজতত্ত্বে, বিধিবিধানের ব্যভিচার লইয়া এতাদৃশ একটা কড়াকড়ি ব্যাপার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেননা, পরিপুষ্ট বিজ্ঞানসম্মত লোকব্যবহারে ব্যভিচারের প্রশ্রয় নাই।

সে যাহা হউক,আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধাতুমাত্রা সমবায়ে সুরতালজ্ঞ ব্যক্তি যখন যে রাগে, যে তালে ইচ্ছা, সেই রাগে ও তালে গীত রচনা এবং গানের সহিত তাহার সঙ্গত করিতে পারেন। কিন্তু 'সঙ্গীতের মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধের পাঠকবর্গ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আমি কথাটি বড় জোর করিয়া বলিতেছি। কারণ বিশ্ববিশ্রুত কবি লিখিয়াছেন, " অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, *** এইজন্য ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম , তখন *** আমার রচনার উপর তালের দেবতা *** ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে, তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম ***। সুতরাং তাঁর সংযমে সঙ্কীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কি উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই।" কবি প্রদত্ত প্রথম দৃষ্টান্তটি এই,—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর, চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝর ঝর তোমার আঁখি পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি কি মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর বাদল নিশীথের ঝরঝর।

ইহার উপর টিপ্পনী স্বরূপে কবি লিখিতেছেন, "এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত , আর — এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না।"

এই ত গেল কবির কথা। ছন্দে যদি দোষ না থাকে তবে, সুরে গান করিলে, কেন তালযোগে তাহার সঙ্গত করা যাইবে না, —একথা কি বেশ পরিষ্কার করিয়া তালতত্ত্ববিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল? সাহিত্যের দৃক্‌ভূমি হইতে কবিতাটি আলোচনা করিবার 'এ' স্থান নহে। কবিতাটি যেমনই হউক, ইহার সপ্তম ও চতুর্থে যতি বিন্যস্ত আছে। আপনারা সকলেই জানেন, বাঙ্গালা পদ্যে হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদ বিবর্জ্জিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দই বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাও সেই একাদশাক্ষরনিবদ্ধ বর্ণবৃত্ত **'বিলাসিনী'** ছন্দের স্বরূপ। **'বিলাসিনী'** ছন্দে, যতি বিন্যাসের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায়, ইহার সপ্তম-চতুর্থে যতি বিন্যাসে, কোনই ক্ষতি হয় না (পিঙ্গলাচার্য্য

কৃত ছন্দসূত্র ষষ্ঠাধ্যায়, ২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদ বিবর্জ্জিত বাঙ্গালা পদ্য সাহিত্যে সপ্তমে-চতুর্থে যতিযুক্ত করিয়া একাদশাক্ষরাত্মক **'বিলাসিনী'**-ছন্দ কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী ছন্দে গান করিলে, তালযোগে তাহার সহিত সঙ্গত অনায়াসে চলিবারই কথা। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালতত্ত্বের মূলীভূত বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, এ বিষয়ে কবির ঔদ্ধত্যকে ভয় করিবার প্রকৃত তালজ্ঞ ব্যক্তির কোনই কারণ নাই। কারণ যাবতীয় **'বিলাসিনী'** ছন্দ, যে শাস্ত্রব্যাখ্যাত তালে সঙ্গত করা যাইতে পারে, সেই একাদশমাত্রাত্মক **"শ্রীশেখর"** তালে, সাতটি তালি ও চারিটি ফাঁক আছে এবং ছন্দের অনুযায়ী সপ্তমে ও চতুর্থে লয় আছে। আপনাদের সমক্ষে পরীক্ষা করিলে, একথার যাথার্থ্য এখনিই প্রতিপাদিত হইবে। সঙ্গত যথা,—

(ধ্রুপদিয়া শ্রীযোগীন্দ্র কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'সুরট মল্লারে' গায়ন ও শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক **'শ্রীশেখর'** তালে সঙ্গত প্রদর্শন।)

এই ত গেল এগারমাত্রার কথা। কবিরচিত আরও একটি গান আপনাদের সমক্ষে পরীক্ষিত হইতেছে। গানটি এই—

"দুয়ার মম পথ পাশে সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন্ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।।
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তার থাকি থাকি।
কখন্ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।।
সবাই দেখি যায় চলে পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ মেঘ ভেসে ভেসে উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে গোপন কোন সুরপুরে,—
স্বপন ওড়ে কোন্ দেশে উদাস মোর প্রাণ পাখী!
কখন্ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।।"

কবিবর কর্ত্তৃক দৃষ্টান্তরূপে ধৃত ইহা নয় মাত্রার ছন্দ। ইহাও অক্ষরবৃত্ত এবং পঞ্চমে ও চতুর্থে যতি বিন্যস্ত। হ্রস্বাদি ভেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাকে ছন্দোমঞ্জরী ব্যাখ্যাত **"মণিমধ্য"** ছন্দের মধ্যে গ্রহণ করা যায় (ছন্দোমঞ্জরী ৩২পৃঃ এবং ছঃকুঃ ২২পৃষ্ঠা)। **'মণিমধ্য'** ছন্দে পঞ্চম চতুর্থে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক ছন্দানুযায়ী গানের সহিত সঙ্গত করিতে হয়, তাহা হইলে যে নয়মাত্রাত্মক **'জনক'** তালযোগে ইহার সঙ্গত করিতে হইবে, সেই তালে ছয়টি তালি এবং তিনটি ফাঁক আছে। আর ছন্দানুবর্ত্তী পঞ্চমে চতুর্থে লয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্গত যথা, —

(শ্রীযোগীন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বসন্তরাগে গায়ন ও শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্গত প্রদর্শন।)

গানের সহিত বাদ্যের ঠেকাটি কিরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধীভূত হইয়াছে তাহা আপনারা

শুনিলেন। কবি লিখিয়াছেন যে, এই পাঁচ চারে যতি বিন্যস্ত নবাক্ষরবৃত্ত ছন্দটিকে উল্টাইয়া চতুর্থপঞ্চমে যতি বিন্যস্ত করিয়া নূতন ছন্দে গান রচনা করিয়া, ছন্দকে "নয় ছয় করা যাইতে পারে"। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, তালজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক তদনুরূপ চতুর্থপঞ্চমে, প্রদর্শিত লয়বিশিষ্ট শাস্ত্র সিদ্ধ তালযোগে সঙ্গত করিয়া সভামধ্যে কবির সহিত নকড়া-ছকড়া খেলিতে পারেন।

আরও একটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কবি লিখিতেছেন, "চৌতাল ত বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও, চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন। এই ত বারো মাত্রা"; —

(লছমীপদ—পূরবী)

"বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা, মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুল ছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।।"

এই ত কবিতা! কবি লিখিতেছেন, "ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়ী করে।"

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বার মাত্রা হইলেই, সেটি হয় একতালা না হয় চৌতাল যে হইতেই হইবে, সঙ্গীতশাস্ত্র এমন কি কোন কঠিন নিয়ম বিধান করিয়াছেন? বার মাত্রার তাল আরও অনেক প্রকার আছে। যেমন **খেমটা, আড়খেমটা, রাস, মোহন** ইত্যাদি। ইহারা প্রত্যেকেই বার মাত্রার ছন্দ। মাত্রার কলনগত প্রভেদ ও লয়ের প্রভেদ হেতু ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। ধামার যে সাত মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ছয়টি পূর্ণ মাত্রা, আর দুইটি অর্দ্ধ মাত্রা। সুদক্ষ বাদ্যকারের হাতে তাহা সম্যক প্রদর্শিত হইতে পারে। এই জন্যই ধামার এখানে খাটিবে না। ঝাঁপতালও দশ মাত্রার তাল, সুতরাং কবিতার ছন্দ যখন বার মাত্রায় নিবদ্ধ, তখন কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী গান করিতে হইলে, ঝাঁপতালেও ইহার সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিলাম না, কোন বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া কবি ধামার এবং ঝাঁপতালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। যাক্ সে কথা। প্রোক্ত দ্বাদশাক্ষর নিবদ্ধ ছন্দটি, ছন্দশাস্ত্রব্যাখ্যাত **'বাহিনী'** ছন্দ। **'বাহিনী'** ছন্দে সপ্তমে ও পঞ্চমে যতি বিন্যস্ত হইয়া থাকে। **বাহিনী** ছন্দে গ্রথিত যে কোন কবিতা সুরযোগে গান করিলে, যে বারমাত্রাত্মক ঠেকা সহকারে সঙ্গত করিতে হইবে, শাস্ত্র সিদ্ধ সেই **"প্রতিমাভঙ্গ"** তালেরও সপ্তমে পঞ্চমে লয় প্রদর্শিত হইয়াছে, সঙ্গত যথা, —

[বঙ্গের অদ্বিতীয়া খেয়ালিয়া সুকণ্ঠী শ্রীমতী যাদুমণি কর্ত্তৃক গায়ন ও বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীআশুতোষ দাস কর্ত্তৃক তল-মৃদঙ্গে সঙ্গত প্রদর্শন।]

আরও একটা পরীক্ষা করা হউক, ইহাও কবি বিরচিত নয়মাত্রাত্মক ছন্দ। নাম **'কমলা'**।

ইহার ষষ্ঠে ও তৃতীয়ে যতি। (ছন্দমঃ ৩৩ পৃঃ এবং ছন্দঃ কুসুম ২২ পৃঃ)। কবিতাটি এই,

লছমীপদ — বাগেশ্রী

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে — সে কাঁদনে সেও কাঁদিল
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে — সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু — মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে — আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে — মহা পারাবার পারায়ে
ফিরিল না আর তরীতে — আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী — আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে — কি ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।।

যে নয় মাত্রাত্মক "কীর্ত্তি"- তালযোগে, ইহার সহিত সঙ্গত করিতে হইবে, তাহারও ষষ্ঠ তৃতীয়ে লয় প্রদর্শিত আছে। সঙ্গত যথা, —

(শ্রীমতী যাদুমণি কর্ত্তৃক গায়ন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীআশুতোষ দাস কর্ত্তৃক সঙ্গত প্রদর্শন।)

সঙ্গতটি কিরূপ হইল, তাহা আপনারা শুনিলেন। কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী বাংলায় বর্ণবৃত্ত ছন্দে গান করিলে, গানটি কি রূপ পরিগ্রহ করিল, তাহা বোধ হয় আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এখন আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী এই কবিতাটিতে প্রচলিত তাল যোজনা করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত করিলে, কবিতার রূপশ্রীর কিরূপ ক্ষয়—অপচয় হয়, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সঙ্গত যথা, — (টপ্পায় গায়ন ও সঙ্গত প্রদর্শন) পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী সঙ্গত করিলে, কবিতাটি যে রূপ পরিগ্রহ করিল তাহা বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রথানুযায়ী মাত্রাবৃত্ত তালে সঙ্গত করিবার সময় কবিতার কোন ভাব (Genius) বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কি না, আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

আচ্ছা, আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য কবিরচিত আরও একটি তথাকথিত নূতন ছন্দ তুলনা করিয়া পরীক্ষা করিতেছি। কবির নূতন ছন্দে গ্রথিত কবিতাটি এই, —

লছমীপদ — কেদারা

ব্যাকুল বকুলের ফুলে — ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কি গোপন বাণী — বাতাসে করে কানাকানি
বনের অঞ্চল খানি — পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে — ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পূরি — কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি — বিরহ সাগরের কূলে।

ইহাও পিঙ্গলাচার্য্য ধৃত **'হলমুখী'** ছন্দ। ইহার তৃতীয়ে ও ষষ্ঠে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। এতদ্ সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "এটা যে কি তাল তা আমি আনাড়ি, জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না।"

ইহা একদেশদর্শী দারুণ অহমিকার কথা। বিশ্ববিশ্রুত কবির মুখে ইহা শোভা পায় না। আমার পাঁজিপুঁথির ভিতরে নাই, অতএব আর কোথাও থাকিবে না, এটা অতীব বিচিত্র ধারণা। যাহা আমি কল্পনার ভিতরে আনিতে পারি না,তাহাই অসম্ভব, ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ কথা। এই গানটি **'বসন্ততালে'** সঙ্গত করিতে হইবে। ''বসন্ততালে কর্ত্তব্যোনগণোমগণস্তথা''। ইহাও নয় মাত্রাত্মক তাল, ইহাতে ছয়টি তাল ও তিনটি ফাঁক আছে। এবং তৃতীয়ে ও ষষ্ঠে যতি বিন্যস্ত হইয়াছে। সঙ্গত যথা, —

(শ্রীমতী যাদুমণি কর্ত্তৃক গায়ন ও বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীআশুতোষ দাস কর্ত্তৃক সঙ্গত প্রদর্শন।)

পরম্পরাগত রীত্যনুসারে সুর তালে সঙ্গত করিলে কবিতায় নিবদ্ধ ভাবের রূপশ্রী কিরূপ বৃদ্ধি হয়, তাহারও আরও একটি নমুনা আপনাদের শুনাইতেছি। যথা—(টপ্পার গায়ন ও সঙ্গত প্রদর্শন)

সঙ্গতটি কিরূপ হইল। তাহা আপনারা শুনিলেন। যে তালে সঙ্গত করা হইয়াছে, তাহাতে কবিতায় নিবদ্ধ ভাবের কোনও বিপর্যয় ঘটিয়াছে কি না, আপনারাই তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

কবির অভিপ্রেত বর্ণবৃত্ত ছন্দানুপাতে গান করা অপেক্ষা পরম্পরাগত স্বরের মাত্রাবৃত্তানুযায়ী গায়ন করিলে গানের রূপশ্রী যে, আশাতীতভাবে উছলিয়া পড়ে, একথা বোধ হয় প্রেক্ষাবানমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমার মনে হয় এতদ্দ্বারা পদ্য-কাব্য এবং সঙ্গীতের পার্থক্যও সূচীত হইল। রসাত্মক বাক্য কাব্য। ভাববাহুল্যে, চিত্তবিনোদনে রসাত্মক বাক্যের প্রভূত প্রভাব অস্বীকার করিবার কাহারও উপায় নাই। বিশ্বের যে রস, যে সৌন্দর্যারাশি ক্রান্তদর্শী কবি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ছন্দ নিবদ্ধ হইয়া অস্মদ্ সমক্ষে যে রূপ-রসে ভাববৈভবের বিচিত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সঙ্গীতে তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। শ্রুতিসুখ সম্পাদনে ও রসোদ্দীপনায়, কাব্যে যে শক্তি নিহিত আছে, সঙ্গীতে তাহা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্রুতি বিনোদনে, বা রসোদ্দীপনায় কবিকে কল্পনার বিচিত্র শক্তির স্মরণাপন্ন হইতে হয় বটে; কিন্তু সেই অপূর্ব্ব শক্তি কাব্যের সঙ্কীর্ণ পরিধি মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। সঙ্গীতে কিন্তু অভূতপূর্ব্ব স্ফুরণের সহিত নানা ছন্দোবন্ধে সেই শক্তি অপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইবার অবসর পায়। যেখানে যতটুকু হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সঙ্গীতে সেইখানে সেই পরিমাণেই প্রয়োগ করিবার সুবিধা ও স্বাধীনতা আছে। মাত্রাযতিসমবায়ে কাব্যনিবদ্ধ ছন্দের দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠবসাধন হয় সত্য। সঙ্গীত কিন্তু যতিমাত্রাদি বিন্যস্ত ছন্দ নিবদ্ধ স্বরাদির আরোহণাবরোহণ, মূর্চ্ছনা, কম্পন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ভাষাকে প্রাণস্পর্শিনী শক্তিতে পরিণত করে। এই জন্যই লোকে 'সঙ্গীতের অনেক নিম্নস্তরে কাব্যের অবস্থান', এইকথা বলিয়া থাকেন। সাহিত্যের পদবহুল গদ্য অপেক্ষা স্বল্প পদবিন্যাসে রচিত রসাত্মক বাক্য যে কারণে শ্রেষ্ঠ, তেমনি কবপদবহুল কাব্য অপেক্ষা কেবল স্বল্প ধাতু মাত্র সমবায়ে সমুৎপন্ন সঙ্গীতও ঠিক সেই কারণেই কাব্য হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত কারণে রসাত্মক বাক্য যে নিয়মে (যেমন কথকতায়) আবৃত্ত হইয়া থাকে, ঠিক তন্নিয়মাধীন হইয়া কবিতা গীত হইবার রীতি নাই। এই জন্যই কাব্যের ছন্দ যে নিয়মে রচিত হইয়া থাকে,

সঙ্গীতের ছন্দ ঠিক তৎবিধানে সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বঙ্গভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ-বিবর্জ্জিত অক্ষর সমবায়ে পদ্য-কাব্যের ছন্দ গ্রথিত হয়। এই জন্য বাংলাছন্দে রচিত কোন কবিতা বিশেষকে গায়নকালে, যে রাগিণী যে কবিতাটিতে সংযোজিত হইবে, সেই রাগিণীর উপাদানভূত স্বরাদি ধাতুতে, কবিতার ছন্দযতিবিন্যাস প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রার বিন্যাস পূর্ব্বক তাহা গানে বসাইবার উপদেশ আছে। গানে ধাতু ও মাত্রাই মুখ্য; কবিতায় নিবদ্ধ পদাবলী মুখ্য নহে। গীতাদিতে, কাব্যের পদসমষ্টি যে মুখ্য নহে,—গৌণ, তাহা বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবি রচিত গীতাদির আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হয়। পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত নহে। শব্দ-বানান করিবার প্রণালীও সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। ঠিক প্রাকৃতের মতনও নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণে বা ছন্দশাস্ত্রে যে সমস্ত নিয়ম আছে, পদাবলীর রচনায় তাহা রক্ষিত হয় নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণও রক্ষিত হয় নাই। ঋ-র-ষ এর পর সংস্কৃতে দন্ত্য 'ন' যেমন মূর্দ্ধ 'ণ' হয়, পদাবলীর শব্দের বানানে সে নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। মূর্দ্ধণ্যকারান্ত ''চরণ'' পদ, বিদ্যাপতির রচিত গীতাদিতে দন্ত্যনকারান্ত হইয়াছে। তার পর হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর ব্যবহারের নিয়ম বড় সূক্ষ্ম ও কঠিন। আমাদের দেশে তাহা সম্যক্ জানা না থাকায় বিদ্যাপতি রচিত পদাবলীর সংস্করণে গীতাদি অত্যন্ত বিকৃতবিদূষ্ট ছন্দ হইয়াছে। বিদ্যাপতির ছন্দ দেখিতে পয়ার-ত্রিপদী সদৃশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা পয়ার-ত্রিপদী নহে। বিদ্যাপতি গানের নিমিত্ত পদ রচনা করিতেন, কিন্তু তদ্সত্তেও আবৃত্তিকালে তাহার যে ছন্দ পতন হইত, তাহা নহে। তিনি সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে। সুতরাং ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। পদাবলীর ছন্দ সংস্কৃত বর্ণবৃত্তছন্দানুযায়ী নহে। বরং পিঙ্গলাচার্য্য ব্যাখ্যাত জাতি বা মাত্রাবৃত্ত প্রাকৃত ছন্দানুযায়ী। গীতাদিতে মাত্রা ও ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের বিনিময় হইয়া থাকে। ইহাও সঙ্গীত শাস্ত্র সঙ্গত। এই সমস্ত কারণে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে, গীতাদি বিষয়ে স্বরাদিতে নিবদ্ধ যে ছন্দ মুখ্য, পদ্য-কাব্য সাহিত্যে তাহা গৌণ মাত্র।

সে যাহাই হউক্ পদ্যকাব্য শ্রেষ্ঠ, কি সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ, একথার বিচার করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ নহে। আমরা দেখিয়াছি, কালপরিমাণার্থক হ্রস্বদীর্ঘাদিমাত্রাবচ্ছিন্ন ধাতু বিন্যাসই ছন্দের স্বরূপ। বৈখরীবাগ্ব্যবহারে শাস্ত্রকারগণ, এই ছন্দকে দ্বিধা ভাগ করিয়াছেন। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দ। সংস্কৃত সাহিত্য উভয়বিধ ছন্দালঙ্কারে বিভূষিত। হ্রস্বদীর্ঘবর্ণবিভেদে যে ছন্দ সংস্কৃতকাব্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণবৃত্তছন্দ। কিন্তু যে ছন্দ হ্রস্বদীর্ঘাদি স্বরভেদে বিন্যস্ত হইয়া গ্রথিত হয়, তাহাই জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। বাংলাসাহিত্যে কিন্তু বর্ণবৃত্তছন্দবহুল। অবশ্য এতদ্বারা বাংলা পদ্যসাহিত্যে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার বর্জ্জিত, একথা বলিতেছি না। কারণ, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্যে আমরা বাংলায় মাত্রাবৃত্তছন্দেরও পরিচয় পাইয়া থাকি। বিদ্যাসুন্দরে যথা, —

''ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ ঘুনু ঘুনু ঘুঙুর বোলে।
লট পট কুন্তল, কুন্তল ঝল মল পুলকিত ললিত কপোলে।।''

অথবা বাসবদত্তায়, —

"আগত সরস বসন্তে, বিরহি দুরন্তে, শোভিত বল্লরী ভালে।"

কিম্বা অন্নদামঙ্গলে, —

চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি, মুখ্যতরে।
হে শিবমোহিনী, শুম্ভনিসূদনি
দৈত্যবিঘাতিনি, দুঃখহরে।।"

কিন্তু এবম্বিধ মাত্রাবৃত্তছন্দের ব্যবহার বাংলার আধুনিক পদ্যসাহিত্যে প্রায় একেবারেই লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক পদ্যকাব্যের ছন্দ অক্ষরসমষ্টিগণনাক্রমে গ্রথিত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। বাংলার বর্ণবৃত্তছন্দ হইতে আবার বর্ণগত হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, বাংলার পদ্যসাহিত্য রচনা হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞানশূন্য। সূক্ষ্ম বাগবস্থায় স্থিত আন্তর জ্ঞান, বৈখরী বাগ্‌ব্যবহারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে। কারণগুণ কার্য্যে বিবর্ত্তিত হয়। আমাদের আধুনিক কবিদিগের অন্তরে যদি সূক্ষ্মাবস্থায় কোনরূপ হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ছন্দবদ্ধ বৈখরী বাগ্‌ব্যবহারে, হ্রস্বদীর্ঘাদিভেদে মাত্রা-কাল-পরিমাণ ভেদ নিশ্চয় পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তাঁহারা স্বেচ্ছায় হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া ছন্দগ্রন্থন নিবন্ধন লঘুগুরু ভেদবিবর্জ্জিত বাংলা পদ্যসাহিত্য যে উজ্জবীর্য্যবিহীন নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে; একথা একটু প্রণিধানের সহিত চিন্তা করিলেই বেশ প্রতীয়মান হইবে।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যড়জাদিস্বরাখ্য ধাতু ও হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে কাল পরিমাণার্থক মাত্রা, এই দুইটি গীত পদার্থের ঘটকাবয়ব। হ্রস্বদীর্ঘাত্মকমাত্রা ও ধাতুর বিনা সমবায়ে গীত পদার্থ রচিত হইতেই পারে না। বাংলা গীতিকবিতা সাধারণত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নিবন্ধ নহে বলিয়া, আধুনিক লঘুগুরু বর্ণবিভেদ বর্জ্জিত ছন্দবদ্ধ কোন কবিতাকে, গায়ন করিতে হইলে, তাহাকে গায়নোপযোগী কোন না কোন মাত্রাবৃত্তছন্দে পরিণত করিয়া লইতে হয়। কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা ও পরীক্ষা করিলে, আমার একথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে।

* * * *

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গীতপদার্থ মাত্রা ও ধাতুঘটিত ছন্দ ও সুরের খানিকটা আলাপ মাত্র। সঙ্গীতে এবম্বিধ আলাপে অভিব্যক্ত ছন্দের নামই, — তাল। এই তাল ও সুরের সমবায় ও বিচিত্র বিন্যাস হইতেই, শাস্ত্রোপদিষ্ট যাবতীয় রাগ-রাগিণীর বিকাশ হইয়াছে। ছন্দশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত কাব্যের ছন্দের সহিত অভিব্যক্ত তালেরও বহু মিল থাকিলেও, সঙ্গীতশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বরাদিনিহিত মাত্রাসঞ্জাত তালের ব্যাপকতা পদ্য সাহিত্যের ছন্দের ব্যাপকতা হইতে অনেক বেশী। কাব্যের ছন্দ হইতে গীত পদার্থের ছন্দের পার্থক্য এইখানেই বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছন্দমঞ্জরী ব্যাখ্যাত, তোটক, বিদ্যুন্মালা, কুসুমবিচিত্রা, প্রভৃতি কয়েকটি ছন্দ, সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত এক ত্রিতালির মধ্যেই গণনা করা যাইতে পারে। এই জন্যই

আমরা দেশীয় গানে, কাব্যের সংখ্যাগত ছন্দবৈচিত্র্য হইতে সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রচলিত তাল সংখ্যা অনেক অল্প দেখিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত হ্রস্বদীর্ঘভেদ বিবর্জ্জিত, বর্ণবৃত্তছন্দে গ্রথিত কোন কবিতাকে গীত-পদার্থে পরিণত করিবার জন্য যেরূপে মাত্রাদি সংযোজন করা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় সর্ব্ববিধ ছন্দে রচিত কবিতা কোন না কোন প্রচলিত তালযোগে গেয় হইতে পারে। এইরূপে, শাস্ত্রব্যাখ্যাত বহুসংখ্যক তাল ব্যবহারে না আসিবার কারণ, অধুনা তাহাদের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। সামগ্রী যদি বহুকাল ধরিয়া ব্যবহারে না আসে, তাহা হইলে তাহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ক্রিয়াকারিত্বে যাহার ব্যাপকতা বেশী, যাহার লীলাক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত, তাহাই ব্যবহারক্ষেত্রে কার্য্যকরি ও উত্তমরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। নির্ব্বাসিত সংকীর্ণের অপ্রসিদ্ধি ও আত্মবিলোপ অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক নিয়মে যোগ্যতমেরই পরিত্রাণ বা উদ্বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কলাতত্ত্বেও এতন্নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অপ্রচলিত তাল সমুদয়ের ব্যাপকতা অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন বলিয়া, অথবা তদুপযোগী ছন্দে গ্রথিত গীতাদির গায়নাদির ব্যবহার নাই বলিয়া, তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় ক্রমশই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। নচেৎ আমার মনে হয়, আমাদের ভাববৈভব যতই সমৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, এমন কোন নূতন ছন্দ ঝটিতি গ্রথিত হইতে পারে না, যাহা গায়নকালে, কোন না কোন শাস্ত্রসিদ্ধ তালযোগে সঙ্গত করা যাইবে না। সঙ্গীত শাস্ত্র বলিয়াছেন, রাগ-রাগিণীর যেমন অন্ত নাই, তেমনি তাল-সংখ্যারও অন্ত নাই। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, 'ভৃগুশাস্ত্র' নামে একখানি ঋষিপ্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র আছে। এই শাস্ত্রের কুণ্ডলীচক্র বিধানটি আমাদের জন্মগত রাশিচক্রের অভিধান স্বরূপ। কাল-বিশেষে গ্রহাদির স্বকক্ষ-ভ্রমণক্রম হইতে তাহাদিগের সমাবেশ সঞ্জাত বহুসংখ্যক কুণ্ডলীচক্র সকল এরূপ বিধিবদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, জন্মতিথিবারাদি পাইলে আমি কেন, যে কোন সামান্য জ্যোতিষতত্ত্ববিদ্‌ আপনাদের প্রত্যেকেরই জন্মরাশিচক্র, তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া, ও ফলাফলাদি মিলাইয়া লইতে পারেন। ইহাও যদি সম্ভব হয়, তবে কাল-ক্রিয়াজাত তাল সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যাপার কেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে? এতদ্বারা আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যিনি ভারতীয় শব্দসংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র ছাড়া আর নূতন তালের কল্পনা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মসঙ্গীতস্বরলিপিতে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রবাবুর উদ্ভাবিত **'নবতাল'**, **'একাদশী তাল'** প্রভৃতি যে দুই-তিনটি নূতন সৃষ্ট তাল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও নূতন নহে। যথোক্ত **'রূপ-কড়া'**ও, তথাকথিত শ্লেষ্মা-ঘটিত চিরপ্রসিদ্ধ **'দাঁতকড়া'**র ন্যায়ই প্রাচীনছন্দ, কেবল নামকরণটি নূতন বটে; কারণ, শাস্ত্রে ইহা অন্য নামে পরিচিত।

সে যাহা হউক, ছন্দের একটা বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাশক্তি আছে। এই ব্যঞ্জনাশক্তি সহায়েই পদাবলীর অন্তরালে নিহিত ভাবটিও এই ছন্দ সাহায্যে শ্রোতার হৃদয়ে একটু বেশ সুনির্দ্দিষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠে। একটি ভাব ছন্দহীন ভাষায় প্রকাশ করিলে যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহা তদুপযোগী ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিলে, তদপেক্ষা আরও যে হৃদয়গ্রাহী হইবে, সেই বিষয়ে কাহারও সন্দেহই

হইতে পারে না! প্রাতঃস্মরণীয় কবিবর মধুসূদন বিরচিত —

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি"! — ইত্যাদি

পদবিন্যাসে অমিত্রাক্ষরছন্দনিবদ্ধ বীরহৃদয়পরিচায়ক ভাবটি, বিশ্ববিশ্রুতকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিরচিত

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
বেলা হল, মরি লাজে" — ইত্যাদি,

পদবিন্যাসে অভিব্যক্ত যামিনী অবসানে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অপরিণতা বুদ্ধিমতী তরুণী অভিসারিকার মর্ম্মপীড়াব্যঞ্জক কুসুমসুকুমার ছন্দে গ্রথিত হইলে, কবি মধুসূদনের অভিপ্রেত বীরভাবটি হৃদয়ে কিরূপ আকারে ফুটিয়া উঠিত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছিলাম তালের একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা শক্তি আছে, এবং তাহার সহিত রাগিণীবিশেষেরও একটা সামঞ্জস্যও আছে। এই সামঞ্জস্য হইতেই রাগরাগিণীর মূল ভাবটিও নানা ছন্দ বৈচিত্র্যে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্যও তাল, সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য্য প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই জন্যই হিন্দুসঙ্গীতে ছন্দের মূর্ত্তির সম্যক্ বিকাশের নিমিত্ত মৃদঙ্গ, তল-মৃদঙ্গ, ঢোল, ডমরু প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতের এই অঙ্গকে শাস্ত্র "আনদ্ধ" এতদাখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ছন্দের নানা ভঙ্গীপ্রকটন জন্যই ইহাদের ব্যবহার। নৃত্যকলাও তাহাই করিয়া থাকে। নৃত্য, 'Poetry of motion expressive of emotion' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বিবিধ ছাঁদে চরণবিক্ষেপাত্মক নৃত্যও গানের ছন্দকেই প্রকাশ করে। আর নর্ত্তনের হাবভাবের পরিচায়ক নানাছাঁদে সুকুমার গ্রীবাহেলন, করাদি সঞ্চালন, অঙ্গবিশেষের প্রকম্পন প্রভৃতি ছন্দের যতি-লয় প্রদর্শন করে মাত্র। গীত-বাদ্য-নৃত্য এতদ্ ত্রিতয়ের ইতরেতর সম্বন্ধ যাঁহারা প্রণিধানের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, সঙ্গীতের তাল, কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের ন্যায় সঙ্কীর্ণ নহে। সঙ্গীতের বিচিত্র ছন্দ প্রদর্শন ব্যাপারে, ইহার ব্যাপকতা নিবন্ধন, কলাবিদের ঘুরিবার ফিরিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। প্রত্যেক ছন্দের গণযতি লয়ভেদে একটা জাতিগত বিশেষ লক্ষণ আছে। গায়ন কালে সেই লক্ষণ সম্যক্ রক্ষা করিয়া, কলাবিৎ নিজ ইচ্ছামত তাহাতে বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু এই বৈচিত্র্য সম্পাদনেও গীতের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে নিহিত ভাববৈভবের কোন বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহারা অনুক্ষণ ছন্দের আত্মগত লক্ষণ রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। সুতরাং ছন্দের বৈজাত্যসঙ্ঘটন হয় না। গায়নকালে ছন্দের লক্ষণগত বিশেষত্ব অটুট রাখিয়া গীত পদার্থকে বিবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যের দ্বারা যথাপ্রয়োজন অলঙ্কৃত করিবার রীতিতেই, আমরা হিন্দু সঙ্গীতকলাবিদ্গণের সংযম ও স্বাধীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। ধ্রুবপদ, লক্ষ্মীপদ, টপ্পা প্রভৃতি দেশীয় গীতাদি গায়নকালে কলাবিদের সংযম ও স্বাধীনতা প্রদর্শনের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কলাবিদের এই সংযম ও স্বাধীনতার পরিচয় আমরা যে কেবল ছন্দেই পাই তাহা নহে।

হিন্দুসঙ্গীতের রাগ রাগিণীতেও ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। যেমন হ্রস্বদীর্ঘাদিভেদে কালপরিমাণার্থক মাত্রা যতি বিন্যাস বৈচিত্র্য হইতে ছন্দবৈচিত্র্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ ষড়জাদিধাতুবিন্যাসবৈচিত্র্য হইতে রাগাদির রূপ চিত্রণে বৈচিত্র্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এই বৈচিত্র্য সম্পাদনেও কলাবিদের যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দের ন্যায় প্রত্যেক রাগিণীর একটা করিয়া বিশেষ লক্ষণ, একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে। জাতিগত সেই লক্ষণাবলীকে রক্ষা করিয়া কলাবিদ্ তাহাকে বিবিধ বৈচিত্র্যে ভূষিত করিতে পারেন। চিত্রকলাবিদেরা কোন একটি জীববিশেষকে চিত্রাপিত করিবার কালে তাহার জাতিগত লক্ষণসমূহ বজায় রাখিয়া, আপন অভিপ্রায়ানুযায়ী তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট, অথবা জরাজীর্ণ শীর্ণ প্রভৃতি যেমন ইচ্ছা, আপনার প্রতিভানুযায়ী ঠিক তেমনি চিত্রণ করিতে পারেন, এ বিষয়ে তাহার যেমন স্বাধীনতা আছে, ঠিক সেইরূপ একটা অপরিমিত স্বাধীনতা সঙ্গীত কলাবিদেরও আছে। এই স্বাধীনতাও স্বেচ্ছাচারিতা নহে; ইহাও সংযমের আত্মপ্রকাশ মাত্র।

হিন্দুসঙ্গীতের রাগ রাগিণীগুলির এক একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে। শব্দার্থগত সম্বন্ধের ন্যায়, রাগ ও তাহার মূর্ত্তি, এতদুভয়নিষ্ঠ সম্বন্ধ ও নিত্য। মূর্চ্ছনা তানাদির দ্বারা রাগাদির সেই রূপটিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়া তুলিতে হয়। এইরূপে জাতিগত বিশেষত্বকে অটুট রাখিয়া, রাগিণীকে যথা প্রয়োজন অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করিতে পারা যায় এবং কলাবিদ্গণ তাহাই করিয়া থাকেন। জাতিগত বিশেষত্ব রক্ষা না করিয়া সুরালাপে অসংযত স্বাধীনতা প্রকাশ উচ্ছৃঙ্খলতার পর্য্যায় মাত্র। উচ্ছৃঙ্খলতায় সামান্য বন্ধন আপাত দৃষ্টিতে ছিন্নভিন্ন হয় বটে, কিন্তু বৈজাত্য সঙ্ঘটনের সহিত, আপনাকেই নাগপাশে আবদ্ধ হইতে হয়, অথবা গানের জাতীয় অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-বিশেষত্ব অটুট রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিকল্পে যথাযথ সংস্কার যে প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সংস্কারসাধনকল্পে জাতির সাজাত্য যদি সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে, প্রোক্ত সংস্কার উন্নতি বিধায়ক হইবে, কি জাতীয় জীবনবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিবে তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলেই সংস্কার সাধিত হইবে। তাহাকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রয়োজন ও সংস্কারের স্বরূপ সম্যক্ অবধারণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সে যাহা হউক, যেমন তালসমূহের এক একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা আছে, ঠিক তেমনই একটি ব্যঞ্জনা শক্তি হিন্দুসঙ্গীতের রাগরাগিণীতেও অনুভূত হইয়া থাকে। রাগরাগিণীতে নিহিত সেই শক্তিই হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যেক রাগরাগিণীর একটি করিয়া বিশিষ্ট রসোদ্দীপনাশক্তি আছে। যেমন একটা বিশিষ্ট রসবিশেষ সিঞ্চিত কবিতা আবৃত্তিকালে, আমরা তদ্রসের আস্বাদ পাইয়া থাকি, সেইরূপ যদি সেই কবিতাটি আমরা তদুপযোগী রাগিণীযোগে যথাযথ তালমানে গান করিতে পারি, তাহা হইলে কবিতাটির কেবল আবৃত্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যে তদ্রসোদ্দীপক হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। হাস্য, বীর, বীভৎস, শৃঙ্গার প্রভৃতি বিবিধ রসে হিন্দুর রাগরাগিণী বিশেষরূপে সিঞ্চিত হইয়াছে।

"স-রী বীরে'দ্ভুতে রৌদ্রে ধো-বীভৎস ভয়ানকে।
কার্যৌ গ-নী তু করুণে হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম-পৌ।।"

বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র রসে, ষড়জঋষভ ব্যবহার করিবে। বীভৎস এবং ভয়ানকে ধৈবত ও গান্ধার; নিষাদ করুণে; এবং মধ্যম ও পঞ্চম হাস্য ও শৃঙ্গার রসে ব্যবহার করিবে। এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, কৈবল্যের ন্যায় বিচিত্র রসভোগবাসনাপরিতৃপ্তিসাধনও হিন্দুসঙ্গীতের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

আমার বক্তব্য এই যে, পদ্য সাহিত্যকে যদি বিবিধ রস সিঞ্চিত করিবার উপাদান থাকে, তাহা হইলে হিন্দুসঙ্গীতেও বিবিধ রসস্ফূরণেরও যে উপাদান আছে, চিন্তাশীলমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। প্রত্যেক স্বরের উপাদানভূত, আত্মপ্রকৃতিগত এক একটি রসবিশেষের ব্যঞ্জনা শক্তি আছে। তাহা আবার অভ্যাস করিলে, অনুপ্রদানাদি দ্বারা বিবিধ স্বরভঙ্গীতে, এই রস বিশেষের স্ফুরণাধিক্য ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্নায়ুবিধানের উপর ষড়জাদির একটা প্রতিক্রিয়া সমুৎপন্ন করিবার সামর্থ্য আছে। যে সমবেদক স্নায়ুসমূহের ঘটকাবয়ব তরঙ্গায়িত হইলে, আমাদিগকে হাস্যরোদনাদি বিকারগ্রস্ত হইতে হয়, গায়নকালীন তত্তৎরসাত্মক স্বরাদির বিচিত্র বিন্যাসজাত এমন রাগাদির নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহাতে সেই সেই স্বরাদির বহুল প্রয়োগ হইয়াছে, যাহাদের হাস্যরোদনাদির হেতুভূত সমবেদক স্নায়ুসমূহকে তরঙ্গায়িত করিবার শক্তি বা সামর্থ্য আছে। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে 'মধ্যম' স্বর হাস্যরসব্যঞ্জক। অর্থাৎ 'মধ্যম' স্বর হাস্যের হেতুভূত সমবেদক স্নায়ুসমূহে বিকার ঘটাইবার শক্তি আছে; অতএব হাস্য রসাত্মক কোন কবিতা গায়ন করিতে হইলে, তাহাতে এমন রাগিণী যোজনা করিতে হইবে, যাহার বাদী সুর বা জানটি কেবলই যে 'মধ্যম' হইবে তাহা নহে, তাহাতে সেই সুরের সমবাদী অনুবাদী প্রমুখ স্বরগুলিরও প্রয়োগ বাহুল্য থাকিবে এবং অনুপ্রদানাদি সাহায্যে ঐ রাগিণীটিকে আবার তদ্রসব্যঞ্জক স্বরভঙ্গীমায় অলঙ্কৃত করিতে হইবে। কেবল ইহাই নহে, যথাপ্রয়োজন অনুপ্রদানাদি সাহায্যে বিচিত্র স্বরভঙ্গীমায় অভিব্যক্ত সেই সুরগুলির পর্য্যায়ক্রমে কেবল আলাপ করিলে, তদ্রাগিণীনিহিত স্বরের একটা সাধারণ উদ্দীপনার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে বটে; কিন্তু তাহা যদি যথাযোগ্য ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তির সহায়তা পায়, তাহা হইলে রাগিণীর ঘটকাবয়ব স্বরূপ সুরগুলি বিশেষ ভাবে নৃত্য করিতে করিতে সমবেদক স্নায়ুসমূহকে বিচিত্র ভাবে তরঙ্গায়িত করিয়া রাগিণী নিহিত রসটিকে বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিবে। শাস্ত্রে ভিন্নভিন্ন রাগিনীর দ্বারা বিভিন্ন রসোদ্দীপনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। ইহাও অবশ্যম্ভাবী। কারণ দেখা যায়, হাস্যাদিরস অনেকতঃ ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি বয়ঃক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ও শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারভেদে রসবোধের নাড়ীর প্রবাহে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শুষ্ক সমতল পথে চলিতে চলিতে কেহ যদি অকারণ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান, তাহা হইলে অপরিণত বুদ্ধি যুবকহৃদয়ে হাস্য রসের উদ্রেক হয়, কিন্তু কোমল হৃদয় প্রবীণেরা করুণরসে আপ্লুত হইয়া উঠেন। বিলাতী ধাঁচের "স্বর সঙ্গতি" যাহাকে 'হারমনি' বলে, আমাদের সঙ্গীতে প্রচলন করিবার কোন আবশ্যক হয় নাই। কারণ বিলাতী স্বরসঙ্গতি বিবাদী সুর সংমিশ্রণে বিকাশ প্রাপ্ত। আমাদের সঙ্গীতে এবম্বিধ কোনও বিবাদী স্বরের সংমিশ্রণ

নাই। কাজেই যখন কোন প্রতীচ্য সঙ্গীতকলাকুশলী বিবাদী স্বরগুলির সংমিশ্রণে কোনরূপ স্বরসঙ্গতি প্রকাশ করেন, তখন প্রাচ্যসঙ্গীত-কলাবিদগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের নিকট এবম্বিধ স্বরসঙ্গতি, তাঁহাদের পরিচিত সঙ্গীত-প্রকৃতির ত্রুটি, বিদ্যুপেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতিমাত্রকেই হাস্যরসাত্মক বলিতে হইবে? বীরভাব ব্যঞ্জক সুসঙ্গত স্বরসঙ্গতি কি বিলাতবাসীকে হাস্যরসে আপ্লুত করে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের যেটি হাস্যরসাত্মক, তাহা ভিন্ন প্রকৃতির, অপরের নিকট তদ্রসব্যঞ্জক নাও হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া, হিন্দুসঙ্গীতে হাস্যাদি রসোদ্দীপনোপযোগী রাগিণী নাই, একথা বলা চলে না। কোন্ রাগিণী কোন্ রসব্যঞ্জক, রাগিণীবিশেষের ধ্যানেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

হিন্দুসঙ্গীতের রসোদ্দীপনা প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ কবি লিখিয়াছেন, "কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা— যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা — আমাদের সংগীতের ব্যবহারে দেখা যায় না।" 'আমাদের সঙ্গীত' অর্থে যদি "বাংলা গান" বুঝায় তাহা হইলে বলিব, সেটার জন্য আমাদের সঙ্গীত দায়ী নহে; প্রচলিত শাসন পদ্ধতির আইন কানুন, বাংলা সঙ্গীতে তদ্ব্যবহারলোপের মূলীভূত হেতু। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি উপদেশ-উপাসনা পদ্ধতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তন্ত্রশাস্ত্র বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। "ভয়ঙ্করের" পূজা বাংলাদেশে যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেরূপ ভারতের কুত্রাপি নহে। সেই তন্ত্রপ্লাবিতদেশে যে বীরোচিত সঙ্গীতাদির ব্যবহার নাই, দেশের হস্তান্তর প্রাপ্তিই তাহার কারণ। বীররসোদ্দীপক কাব্যের এবং তদঙ্গীভূত গানের ব্যবস্থা ছিল কিনা, শ্রদ্ধেয় গুণী মার্দ্দঙ্গী শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুঁজি হইতে সংগৃহীত বক্ষ্যমাণ গীতিকবিতা বই তাহা প্রমাণিত করিবে।

রাগিণীকুন্তল—তালজগবন্ধ

অশদল গজদল সাজন্তি রামা
যোবান্যা বীর করন্তি এইয়া
অরি কুল দল মারন্তি রে।
সুরগণে সাজন্তি যোঝন্তিরে
লঙ্কাপত ডরে থরথর ইয়া

[সঙ্গীত যথাঃ— ধাগে তেটে তাগে তেটে তাগে তেটে কেটে তাগ তাগ তাগ তাগে তেষ্টে তাগে তেটে কেটে তাগ, তাগে তেটে তাকা দুমা কেটে তাটা গদিঘেনে।]

পৃথ্বীরাজের জীবনী সমালোচনা করিলে, কিংবা তদীয় রাজকবি বিরচিত গীতাবলীর আলোচনা করিলে, আপনারা দেখিবেন, **'মতিদানা তোটক'**, প্রভৃতি ছন্দে **'খড়্কা'** নামক গীতাদি যথাযথভাবে গায়ন করিলেই আপনাদের অবসন্ন হৃদয় বীররসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

"ঝল্ ঝল তেজ ঝলাঝল গেল। টট্টর রথ্য অপক্ষর পেল।।
ঠঠঠঠ মিল্লিয় পিল্লিয় পায়। ডরড্ডর কাহর দেহ ডরায়।।

ঢরক্কর মুণ্ড নিরযায় নৈন। তরক্কয় তীর বরক্কয় বৈন॥
থরক্কয় সৈন মুরক্কহি নাহি। দরব্বর দৌর পরৈ দল মাহী॥
ধরদ্ধর ধারহি মারহি চুর। ন চৈ ভ্রমভূত সচেতন পূর॥
পরপ্ফর ফূট্টত গাত সপূর। ফরস্ফর ফৈলত ফেরত তূর॥
বরব্বর বেদল আয়ধ বুট্টি। ভরভ্ভর ভাজত নাহিন রুট্টি॥
মরম্মর ছেদহি মার মুছাল। জরজ্জর নাচত ধায় চটাল॥
বরব্বর ফূরত সংগি সুলগ্‌গি। সুরাসুর দেখত খেলত খগ্‌গি॥"

স্যার রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নহে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐশ্বর্য্যদোলায় দোলায়মান প্রাচীন রাজাধিরাজপ্রমুখ জমিদারগণ গোবিন্দ দাসের ন্যায় কি উক্তরসে বঞ্চিত ছিলেন? আপনারা বোধ হয় অনেকেই "ভাঁড়েদের" গান শুনিয়াছেন। সে গানে কি বিলাতী সুর সংযোজিত হইয়াছে? বাংলার প্রাচীন কবিগণ মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বশেষ কবি। প্রকৃতির ত্রুটি যদি হাস্যরসের হেতুভূত কারণ হয়, তাহা হইলে গুপ্ত কবি রচিত বক্ষ্যমান গানটি কি প্রকৃতির ত্রুটির পরিচায়ক নহে। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচারিত হাস্যরসাত্মক গান অনেকতঃ এতদনুরূপ ভাবব্যঞ্জক। গুপ্তকবি গ্রথিত হাস্যরসাত্মক গানটি এই —

(পরজ কালাংড়া — খেম্‌টা)

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান হল ভার।
হ'ল পূর্ণিমিতে অমাবস্যে, তে পহর অন্ধকার।
(এসে) বৃন্দাবনে ব'লে গেল বামী বোষ্টমী,
(এবার) একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী;
ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজার দিন এবার।
ময়রা মাগী ম'রে গেল মেরে বুকে শূল
(আর) বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বচ্ছে চুল
কাল বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হল ছারখার,
(ঐ) সৃজ্জিমামা পূর্ব্বদিকে অস্ত চলে যায়;
আর উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে আজ
বাতাস লেগ্‌ছে গায়;
সেই রাজার বাড়ী টাট্টু ঘোড়া
সিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী, ধোপা শামী হাস্‌তেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে দুজন,
(কাল) কামরূপেতে কাক মরেছে
কাশীধামে হাহাকার।।

আরও একটা গান আপনাদের শুনাইতেছি। ইহাও প্রাচীন গান, এবং হিন্দুসঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী রাগিণী ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।—

জঙ্গলা

আর কিছু কি বাঁকা নাইকো সই।
বাঁকা শ্যামের বাঁকা নয়ন বই।
বাঁকা যত নদ নদী, খাল গঙ্গা যমুনা
তাতে চলে বাঁকা তরী চেয়ে দেখনা,
চক্ষের উপর বাঁকা ভুরু, সোজা হলে সাজে কই।
লিখতে গেলে সবই বাঁকা হয়,
মাত্রা দাঁড়ি সোজা তারা কোনই কাজের নয়,
(আবার) হলধরের হলটি বাঁকা, তাতে তিনি জগৎজয়ী॥
সকল পাখির পা বাঁকা, গয়লার বাঁক বাঁকা
টাকায় সতের আনা পাখির ঠোঁট বাঁকা
ঘি তুলিতে আঙ্গুল বাঁকা, সোজা হলে চলে কৈ।

ইহাতেও বিলাতী সুরের রেশমাত্র নাই। সুতরাং হাস্যরসাত্মক করিতে হইলে, স্বভাবতই বিলাতী ছাঁদের কেন হইবে, একথা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অবশ্য আমরা যদি বিলাতী ধরণে হাঁসি-কাসি, বিলাতী ধরণে আহার-বিহার করি, বিলাতী ধরণে ভোগ-বিলাস করি, তাহা হইলে বিলাতী সংস্কার বশতঃ বিলাতী স্বর ভঙ্গিমায় আমাদের কথা কহিতে হইবে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর রাগরাগিণীরও বৈজাত্য সঙ্ঘটন হইতে থাকিবে। আপনাকে হারাইয়া পরকে পাওয়া, অনাত্মাকে আত্মাবোধে পূজা করা, যদি উন্নতির ধর্ম্মগত লক্ষণ হয়, তবে সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই।

হিন্দু রাগিণী প্রসঙ্গে আরও এক কথা আছে। তাহা ইউরোপীয়, হার্ম্মনি অর্থাৎ রবীন্দ্রবাবুর "স্বর-সঙ্গতি"।

আপনারা অবগত আছেন যে, ষড়জঋষভাদি স্বরসপ্তকে হিন্দু শাস্ত্র কল্পিত উদারাদি সংজ্ঞক এক একটি গ্রাম রচিত হইয়াছে। গ্রাম সুতরাং স্বরসপ্তকেরই পর্য্যায় মাত্র। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এবম্বিধ উত্তরোত্তর ক্রমে স্বরবিন্যাসে রচিত গ্রামত্রিতয়ের অপেক্ষা আরও অনেক গ্রাম কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যকণ্ঠে প্রোক্ত গ্রাম ত্রিতয়ের ব্যতিরিক্ত স্বর বিনির্গত হয় না বলিয়া, ত্রিসপ্তকের উপাদানভূত একবিংশ শুদ্ধ স্বর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতীচ্য সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণ, এই স্বরগ্রামকে "অক্টেভ" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'অক্টেভ' অর্থে 'অষ্টক' বুঝায়। সুতরাং ইংরাজী হিসাবে তিন অক্টেভের উপাদানভূত শুদ্ধ স্বরসমূহ সংখ্যায় চতুর্ব্বিংশতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যকালীন তৎ সমুদায়কে পাওয়া যায় না। ইংরাজী হিসাবে চতুর্ব্বিংশতি স্বর স্থলে ব্যবহারকালে আমরা মাত্র দ্বাবিংশতি স্বর পর্য্যায়ক্রমে গণনায় পাইয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুই বা ততোধিক গ্রাম একত্র গ্রহণ করিলে প্রতীচ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট গ্রামের স্বরূপ-চ্যুতি ঘটে। ঔপপত্তিক স্বরূপভ্রষ্ট স্বরগ্রামের উপর, প্রতীচ্য স্বর-সঙ্গতি প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই স্বরসঙ্গতি (Harmony) প্রতীচ্য কলাবিদেরা সুরের অলঙ্কার স্বরূপে

ব্যবহার করেন। প্রতীচ্য সংস্কারসঞ্জাত এই স্বরসঙ্গতিরূপ অলঙ্কার দ্বারা পূজ্যপাদ রবীন্দ্রবাবু ভারতীয় সঙ্গীতকে বিমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের রাগরাগিণীর আলাপে অভিব্যক্ত তানকর্ত্তব্যাদি ভারতীয় অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে তিনি বিদেশীয় ''স্বরসঙ্গতি'' রূপ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু লিখিতেছেন, ''হার্মনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই তাকে একান্তভাবে যদি য়ুরোপীয় একান্তভাবে তাকে বলিতে হয়, তবে এ কথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যে-হেতু এটা সত্যবস্তু ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই।''

কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর লেখনী প্রসূত এবম্বিধ কথা সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, হিন্দু রাগাদির চিত্রাঙ্কণে নাদতত্ত্ববিদ্ কর্ত্তৃক যাহা ''কর্ত্তব্য'' রূপে স্মরণাতীত কাল হইতে অবধারিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে বর্জ্জন করিয়া রাগিণীবিশেষকে রূপভ্রষ্ট করিবার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে? ভারতীয় রাগিণীবিশেষের আলাপে অভিব্যক্ত তানকর্ত্তব্যাদি রূপে যে অলঙ্কারাদি আমরা শ্রুতিগোচর করিয়া থাকি, তাহা তদ্‌রাগিণীর উপাদানভূত সমবাদী অনুবাদ্যাদিভেদে স্বরাদিরই বিক্ষেপ, প্রক্ষেপ, প্রস্তার, প্রকম্পন সমুদ্ভূত। রাগিণীবিশেষকে প্রোক্ত তান কর্ত্তব্যাদি বিবর্জ্জিত করিয়া গান করিলে সমানপ্রসবাত্মিকা স্বরূপ তাহার যে কেবল জাতিগত লক্ষণবিশেষ বিনষ্ট হইবে তাহা নহে; বৈরীস্থানীয় বিবাদিস্বর সাহায্যে বিজাতীয় কৃত্রিম অলঙ্কারে তাহাকে বিমণ্ডিত করিলে, তাহার বৈজাত্য সঙ্ঘটনই হইবে। যদি বৈজাত্য সঙ্ঘটনই উন্নতিবিধায়করূপে অবধারিত হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। আমার ধারণা নিরন্তর বৈজাত্য সঙ্ঘটনক্রমে জাতীয় আত্মার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আজ আমরা সকলে যদি বিজাতীয় ভাবাপন্ন হই, তাহাদের বেশভূষায় বিভূষিত হই, দশবিধ সংস্কার পরিবর্জ্জন করিয়া, আচার ব্যবহারে, প্রিয়ার সম্ভাষণে, যদি কেবল বিজাতীয় হাবভাব ও ছাঁদ অনুকরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের জাতিগত ব্যক্তিত্ব বিশেষত্ব বিলোপের সহিত, তাহার অতীত কাহিনী হইতে আমরা যে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িব, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি বিধানটি যে, স্বাভাবিক নহে, ইহা বিজাতীয় সংস্কারসঞ্জাত কৃত্রিম পদার্থ তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি Dryden ধ্যাননেত্রে জ্যোতিষিক সৃষ্টিতে, বিরাট বিশ্বে সমন্তাৎব্যাপ্তরূপে নিহিত যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রতীচ্য সঙ্গীতকলাকুশলী ব্যাখ্যাত রাগিণীবিশেষে বিসম্বাদী পদার্থের কৃত্রিম সংযোজন (addition) নহে। তাহা উপাদানভূত ধাতুমাত্রাসমবায়ে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের স্ফুরণ মাত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন, 'In addition there is no chemical addhesion or inherent attraction'. অর্থাৎ সংযোজনা অন্তর্নিহিত আকর্ষণশক্তি বিরহিত উপাদানভূত ঘটকাবয়বের কৃত্রিম সন্নিবেশ মাত্র। প্রতীচ্য সঙ্গীতে যে স্বরসঙ্গতিরূপ অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, তাহা এবম্বিধ সংযোজন হইতে বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। Strangways সাহেব প্রাচ্য-প্রতীচ্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত অলঙ্কার বিশেষের তুলনাবসরে বলিয়াছেন, ''We think of grace-

notes as something '''added to the note, not as something actually inherent in it' ' ' Indian grace is different in kind, there is not the least suggestion of anything having been added to the note which is graced.''

প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি দেশ কালাবচ্ছিন্ন, বিজাতীয় সংস্কারজাত লক্ষণে বিভিন্ন। হিন্দু রাগরাগিণীবিশেষে তান-কর্ত্তব স্থানে তৎযোজনার প্রশ্রয় প্রদান করিলে জাতীয় সঙ্গীত মুক্তি না পাইয়া, বৈজাত্য সঙ্ঘটনক্রমে একান্তভাবে যে মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আরও এক কথা। প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি বিধানটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিদ্‌গণের মধ্যেই বিশেষ মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা বর্ব্বরজনোচিত। সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ লব্ধপ্রতিষ্ঠ Rousseu বলিয়াছেন, প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি বিধানটি অসভ্য Goth জাতি কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, সঙ্গীতে ইহা স্থূলদর্শীর পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবম্বিধ মতদ্বৈধ বর্ত্তমান, যাহা অত্যন্ত আধুনিক এবং যাহার স্বরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, হিন্দুসঙ্গীতকে সেই বিজাতীয় বেশে বিমণ্ডিত ও তদ্‌ভাবে ভাবিত করিবার যে চেষ্টা, তাহা জাতীয় জীবনের সাধকদিগের পক্ষে কতদূর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে, সুধীগণই তাহার বিচার করিবেন।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় শিল্পসাহিত্য বিদ্যাদির সংস্কার সাধন আবশ্যক ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু সংস্কারাদিও স্বাজাত্য সংরক্ষানবসরেই করিতে হইবে। দেহে যে বিস্ফোটক হইয়াছে, তাহা যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলম্বনে আরোগ্য না হইয়া যায়, তবেই অস্ত্রদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিতেই হইবে। নচেৎ স্ফোটক দর্শনেই অস্ত্র চালাইবার যে ব্যবস্থা তাহা সভ্যতার পরিচায়ক নহে, তাহা বর্ব্বরোচিত কসাইগিরী। প্রতীচ্য দেহতত্ত্ববিজ্ঞানানুমোদিত অস্ত্রবিদ্যা প্রাচ্য দেহে প্রয়োগ করিলে, দেহের বৈজাত্যসংগঠিত হয় না সত্য, কেননা তাহা ব্যাধিবিনাশের উপায়মাত্র; কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতে প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি বিধানটি অস্মদ্দেশীয় সঙ্গীতের তৎস্থানীয় নহে; পূজ্যপাদ কবির একথাটি একটু অনুধাবন করিয়া বুঝা উচিত ছিল। বিলাতী অস্ত্র অস্মদ্দেহে প্রবৃষ্ট হইয়া থাকে না। আর যেখানে তাহা থাকে, তখন তাহা তদ্দেহকে দুর্ব্বল করিতেই থাকে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কীর্ত্তনাদি বাউল সঙ্গীত শাস্ত্র ছাড়া ব্যাপারনহে। তৎসমুদয়ই সংকীর্ণ রাগিণীরই অন্তর্ভূত এবং তাহার তালতত্ত্বও তন্নিয়মে নিয়মিত।

ভারতীয় সঙ্গীত সুরস্বরানুক্রমন প্রধান (melody)। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, স্বরানুক্রমণের পুষ্টি সাধনজন্য স্বরসঙ্গতি (Harmony) ব্যবহার হইয়া থাকে। ''Harmony is to enrich the melody'' । ভারতে কিন্তু এই স্বরানুক্রমণের পুষ্টিসাধনরূপে বিবাদী (Dissonent)-সুর বর্জ্জন করিয়া বাদী, সমবাদী অনুবাদী স্বরসমূহের ব্যবহার হইয়া থাকে; যেমন বেহাগ উপরাগে ঋষভ ও ধৈবত বিবাদীবর্জ্জন করিয়া গান্ধার বাদী, শুদ্ধ নিষাদ গ্রহ, এবং বক্রী সমুদায়গুলি অনুবাদী স্বরূপে ব্যবহার নিবন্ধনই রাগটির সুস্বরানুক্রমণটি পরিপুষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের স্বরসঙ্গতিজনিত পুষ্টিসাধনবিধিটি, যদি ভারতের সুস্বরানুক্রমিক-প্রধান সঙ্গীতের স্বরূপ বিনাশ করে, তাহা হইলে সরল ভাষায় বলিতে হইবে তৎবিজাতীয় স্বরসঙ্গতি প্রথাবলম্বনে ভারতীয় সঙ্গীতের পুষ্টিসাধন প্রয়াস, পুত্রকামনায় পতির মস্তক চর্ব্বণ

ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবম্বিধ সংস্কারসাধনে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, বরং আত্মবিলোপই ঘটিয়া থাকে। ভোগায়তন শরীরকে ছিন্নভিন্ন করিলে যদি মুক্তি করতলগত হয়, তাহা হইলে কুক্কুর শৃগালেরাও দেহপাতে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি রবীন্দ্রবাবু কথিত সংস্কার সঙ্গীতের মুক্তি নহে — তাহা ভারতীয় সঙ্গীতের মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি। Strangways সাহেবও ঠিকএই কথাই বলিয়াছেন; —"And the first thing that harmony would do, if now applied even tentatively, would be to get rid of that feeling and those functions and with them of the grace notes and all that makes Rag worth having ' ' ' To add harmony to it is to kill it."

এইরূপে বহুল কৃতবিদ্য সুনিপুণ সঙ্গীততত্ত্ববিদের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায় যে আমাদের রাগরাগিণী পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত স্বরসঙ্গতিরূপ অলঙ্কারে বিমণ্ডিত করিলে তাহাদের স্বজাতিত্ব ও সার্থকতা আর থাকিবে না এবং রবীন্দ্রবাবুও একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকৃত মন্তব্য হইতেছে এই যে, আমাদের রাগরাগিণীতে যে বিশিষ্টতা আছে তাহা ত আছেই; তবে তাহাদের মূল ঠাটগুলি লইয়া তদন্তর্গত তানকর্ত্তব্যাদির পরিবর্ত্তে যদি আমরা প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি আমাদের ব্যবহারে আনি, তাহা হইলে, এমন এক নূতন জাতির সঙ্গীত সৃষ্ট হইবে, যাহার একান্ত অভাব আমরা সঙ্ঘবদ্ধজীবনের কার্য্যকলাপে নিত্যই উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা যদি পাঁচ-সাতজন মিলিত হইয়া গায়নাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে স্বরানুক্রমন প্রধান একাকী গেয় কোনও রাগিণী আমাদের সকলকে এককালে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। বিরাট সভাসমিতিতে অথবা প্রবাহমান মিছিলে, যে পদ্ধতিতে মিলিত কণ্ঠে গান গাওয়া হইয়া থাকে, তাহা একরূপ গোলেহরিবোল দেওয়া মাত্র। কারণ বিবিধ যন্ত্র সাহায্যে ও নানা ছাঁদে যতই ইহার সহিত সঙ্গত করি না কেন, গান তেমন জমেনা, সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় তেমন যথাযোগ্য ভাবে উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয় না। কিন্তু স্বরসঙ্গতিরূপ অলঙ্কার বিমণ্ডিত রাগরাগিণী হইতে তাহা আশা করা যায় এবং এইখানেই এই সব সৃষ্ট সঙ্গীত এবং সঙ্গতাদির প্রয়োজন ও সার্থকতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাই রবীন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। সুতরাং ইহা চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয়ও বটে।

আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে যে, পাঁচসাত জনে মিলিয়া অথবা প্রবাহমান মিছিলে সমবেত স্বরে গান করিবার রীত্যনুসারে উপযোগী রাগিণীকে 'রক্তা'-দি অলঙ্কারে বিমণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রেও আছে, কিন্তু ব্যবহারে তাহা প্রচলিত নাই। প্রতীচ্য স্বরসঙ্গতি দেশীয় সঙ্গীতে সংযোজন পরিবর্ত্তে আমরা যদি প্রোক্ত রক্তাদি অলঙ্কারের সাহায্য লই, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গীতে বৈজাত্য সংঘটিত হয় না, অথচ প্রতীচ্য শাস্ত্র ব্যাখ্যাত স্বরসঙ্গতি অপেক্ষা আমরা আরও উৎকৃষ্ট সামগ্রী পাইয়া থাকি। প্রোক্ত রক্তাদি ত্রৈস্বরাত্মক অলঙ্কারে বিমণ্ডিত রাগাদির আলাপ করিলে, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না, বারান্তরে আমরা তাহার আলোচনা ও সঙ্গতরীতি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

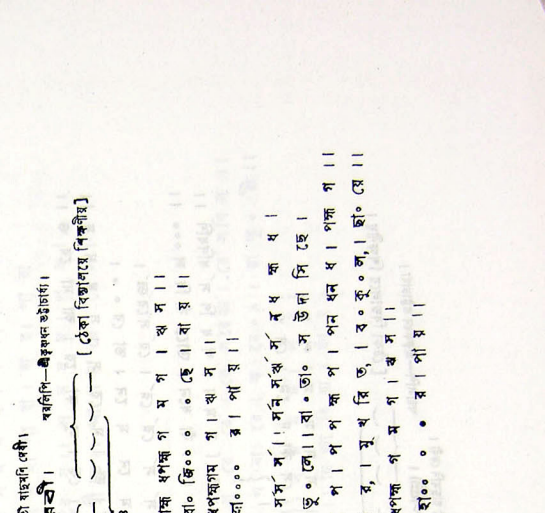

সুর—শ্রীমতী যাদুমণি দেবী।
কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ। বাগেশ্রী। স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য।
তাল—কীর্ত্তি, ছন্দ= ৪ [ঠেকা বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়।

ম ম ম ম। মপধ জ্ঞ। ম র স।। স ম ম ম। প ধ।
যে কাঁ দ নে। হি০০ য়া। কাঁ দি ছে।। সে কাঁ দ নে। সে ও।
নি র্স ধণিধণি।। { নিধ প ম ম। }
কাঁ দি ল০০০০।। { যে০ কাঁ দ নে। }
নিধ প ম ম। মপধ জ্ঞ। ম রে স।। স। ম ম ম। প ধ নি র্স ধণিধণি।।
যে০ বাঁ ধ নে। মো০০ রে। বাঁ ধি ছে।। সে। বাঁ ধনে। তারে বাঁ ধি ল০০০।।

ম ম ধ ধ। নি নি। র্স র্স র্স।। র্স র্স র্রে র্রে। র্রে র্সর্রেজ্ঞ।
প থে প থে। তা রে। খুঁ জি নু।। ম নে ম নে। তা রে০০।
র্রে র্সনি র্স।। নিধ। নিধ প ম। মপধ। জ্ঞ। ম রে স। স ম ম ম।
পূ জি০ নু।। সে০। পূ০ জা র। মা০০। ঝে। লু কা য়ে। আ মা রে ও।।
প ধ। নি র্স ধণিধণি।
সে যে। সা ধি ল০০০।।

স স রে রে। পমপম জ্ঞ। ম রে স।। স ম ম ম। প ধ। নি র্স
এ সে ছি ল। ম০০০ ন। হ রি তে।। ম হা পা রা। বা র। পা রা
ধণি ধণি।। নিধপ ম ম। মপধ জ্ঞ। ম রে স।। স ম ম ম। প ধ।
য়ে০ ০ ০।। ফি০ রি ল না। আ০০ র। ত রী তে।। আ প না রে। গে ল।
নি র্স ধণিধণি।।
হা রা য়ে০০০।।

ম ম ধ ধ। নি নি। র্স র্স র্স।। র্স র্স র্রে র্রে। র্রে র্সর্রেজ্ঞ। র্রে র্সনি র্স।।
তা রি আ প। না র। মা ধু রী।। আ প না রে। ক রে০০। চা তু০ রী।।
নিধ নিধ প ম। মপধ জ্ঞ। ম রে স।। স ম ম ম। প ধ।
ধ০ রি০ বে কি। ধ০০ রা। দি বে সে।। কি ভা বি য়া। ফাঁ দ।
নি র্স ধণিধণি।।
ফাঁ দি ল০০০।।

সুর—শ্রীমতী যাদুমণি দেবী।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ। **কেদারা।** স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য।

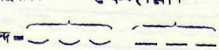

তাল—বসন্ত, ছন্দ= ◡ ◡ ◡ — — — [ঠেকা বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়।

৪

প ম গর । স ম ম ম । প ক্ষপ ।। প মপধনর্স র্স । ধ প ম ম । র স ।।
ব্যা কু ল । ব কু লে র । ফু॰ লে ।। ভ্র ম॰॰॰॰ র । ম রে প থ । ভু লে ।।
প ধ প । র্স র্স র্স র্স । র্স র্স ॥ নি ধ ধ । র্র র্র । নির্স নির্স ধ প ।। ম ম ম । প প
আ কা জ্জে । কি গো প ন । বা ণী ॥ বা তা সে । ক রে । কা॰ না॰ কা নি ।। ব নে র । অ ন
গ ম । র স ।। স ম ম । প ক্ষপ র্স র্স । ধ প ।।
চ ল । খা নি ।। পু ল কে । উ ॰ ঠে দু লে । দু লে ।।

স রে স । ম ম ম ম ম । পক্ষ প ।। প মপধনির্স র্স । ধ প ম । ম রে স ।।
বে দ না । সু ম ধু র । হ॰ য়ে ।। ভু ব॰॰॰॰ নে । গে ল আ । জি ব য়ে ।।

প ধ প । র্স র্স র্স র্স । র্স র্স ।। নি ধ ধ । র্রে র্রে নির্স নির্স । ধ প ।।
বাঁ শি তে । মা য়া তা ন । পূ রি ।। কে আ জি । ম ন ক॰ রে॰ । চু রি ।।
ম ম ম । পক্ষ প গ ম রে । স স ।। ম ম । পক্ষ প র্সনি র্সনি । ধ প ।।
নি খি ল । তা॰ ই ম রে ঘু । রি বি ।। র হ । সা॰ গ রে॰ র॰ । কূ লে ।।

সুর—শ্রীমতী যাদুমণি দেবী।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ। **সিন্ধুড়া।** স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য।

তাল—শ্রীশেখর, ছন্দ= ◡ ◡ ◡ — — — — [ঠেকা বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়।

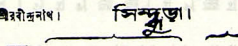

৪

ম র্স র্স । র্র র্জ্জ র্র র্স । র্সর্র ণি ধ প ।। মপ জ্জ ম । র স র্স র্স । র্সর্র ণি ধ প ।।
কাঁ পি ছে । দে হ ল তা । থ॰ র থ র ।। চো॰ খে র । জ লে আঁ খি । ভ॰ র ভ র ।।

ম প প । নি নি নি নি । র্স র্স র্স র্স ।। নি র্স র্র । র্র র্জ্জ । র্র স র্সর্র ণি
দো দু ল । ত মা লে রি । ব ন ছা য়া ।। তো মা র । নী ল । বা সে নি॰ ল
ধ প ।। ম প নি । র্স র্স র্স র্স । র্সর্র ণ ধ প ।। জ্জ জ্জ ম । র স র্স র্স । র্সর ণি ধ প ।।
কা য়া ।। বা দ ল । নি শী থে রি । ঝ॰ র ঝ র ।। তো মা র । আঁ খি প রে । ভ॰ র ভ র ।।

র্ ধ ধ । ণি ণি ধ প । মপ জ্ঞ র্ স ।। স র্ ম । প ধ ধপ ধ ।
যে ক থা । ছি ল ত ব । ম৹ নে ম নে ।। চ ম কে । অ ধ রে৹ .র ।
র্স ণি ধ প ।।
কোনে কোনে ।।

ম প প । নি নি নি নি । র্স র্স র্স র্স ।। র্স র্স র্র । র্র র্জ্ঞ র্জ্ঞ র্র ।।
নী র ব । হি য়া ত ব । দি ল ভ রি ।। কি মা য়া । স্ব প নে যে ।।

র্সর্র ণ ধ প ।। জ্ঞ জ্ঞ ম । প ম প জ্ঞ জ্ঞ । ম প.জ্ঞ ম র স ।। ম প নি । র্স র্স র্স র্স ।
ম৹ রি ম রি ।। নি বি ড় । কা ন ৹ নে র । ম ৹ র ৹ ম র ।। বা দ ল । নি শী থে রি ।
র্সর্র ণি ধ প ।।
ঝ৹ র ঝ র ।।

Price : Rs. 40
Vol. 21 No.3

BIVAV
Special music issue
January-March 2000

Reg No : 30017/76
78th issue

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO ISSN 0970-1885

শীঘ্রই মুক্তি পাচ্ছে

কবি-চিত্রপরিচালক

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর

নতুন কাহিনীচিত্র

উত্তরা

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে
অসামান্য কাব্যিক উপস্থাপনে
ও দৃশ্যের মৌল নির্মাণে
এই ছবি পরিচালকের জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাণ